ন হন্যতে

মৈত্রেয়ী দেবী

প্রাইমা পাবলিকেশনস্
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৫৮
প্রকাশক : উপমা সেনগুপ্তা
প্রাইমা পাবলিকেশনস্‌
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
মুদ্রক : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলিকাতা-৯

আমার মা

স্বর্গীয়া হিমানীমাধুরী দাসগুপ্তাকে

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫২

আজ আমার জন্মদিনের উৎসবে তোমরা এসেছিলে পার্বতী ও গৌতমী। তোমরাই উৎসব করেছিলে কিন্তু তোমরা জানতে না, তখনই—ঠিক তখনই, যখন এ ঘরে গান হচ্ছিল, গল্প হচ্ছিল, আমি হাসছিলাম, তখন আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছিলাম। সময়ের প্রবাহ আমার মনের মধ্যে উত্তাল, আমাকে তা ছুঁয়েছিল, আমি চলেছিলাম, চলেছিলাম ভবিষ্যতে নয় অতীতে।

এখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে, হয়তো দুটো বাজে—আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি—এখান থেকে পূর্ণ আকাশ দেখা যায় না, আধখানা সপ্তর্ষি অনন্ত প্রশ্নের মতো আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন, আজ এই প্রশ্ন কত যুগ পার হয়ে আবার কেন মনে এল? কেন আমার জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার কোনো প্রয়োজন ছিল না? আবার দেখছি এর আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

আকাশের তারাগুলি উজ্জ্বল, কত মানুষের কত যন্ত্রণার সাক্ষী ওরা। আমার সমস্ত মন ঐ আকাশটা টানছে—আমি যেন এখানে নেই,—এখানে নেই অথচ আমি তো এখানেই। এখান থেকে কি কোথাও যেতে পারি—এই তো আমার পরিচিত সংসার। শোবার ঘরে আমার স্বামী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। কী নিঃসংশয় আমার সম্বন্ধে, আমাকে উনি ভালোমতো চেনেন না, অথচ কী গভীর ভালোবাসেন, কী বিশ্বাস আমার উপরে! আমিই ওঁর সব। ওঁর পৃথিবীটা ঘুরছে আমাকে কেন্দ্র করেই, কিন্তু উনি যে আমার সব নয় একথা নিশ্চয় উনি কোনো একরকম করে জানেন, তবু তাতে ওঁর কোনো ক্ষোভ নেই। ক্ষোভ নেই আমারও। আমার জীবন নানাদিক থেকে কানায় কানায় পূর্ণ। সংসারকে যা দেবার ছিল, মনে হয়েছিল তা দিতে পেরেছি, ভালোবাসার যে মহিমা, মনে হয়েছিল তাও জানি, শ্রদ্ধা ও পূজার সঙ্গে মিশে তার অলৌকিক ঊর্ধ্বগামী নিবেদন আমার গুরুর প্রতি, আমাকে কৃতার্থ করেছে। তবু কাল থেকে আমার জীবনের আস্বাদ কি করে এমন বদলে গেল? কী দারুণ অতৃপ্তি, এক ধূ ধূ সাহারার বালির আঁচলের মতো আমার শস্যশ্যামল সুন্দর পৃথিবীর উপর বিছিয়ে গেল! আমি জানি ওর নিচে সব আছে, ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি। এখনও ওঁর অবচেতনে আমি তেমনি সত্য—আর উপরে মা-বাবার কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে আমার নাতি, কাল সকালে সে যখন নেমে আসবে, তখন তার

নরম ছোট্ট হাত আমাকে তেমনি করে জড়িয়ে ধরবে—আমার পৃথিবী তেমনি আছে কোমল সজীব সবুজ। তবু এর উপর গলিত লাভা গড়িয়ে আসে কেন, আমার মুখে যে গরম বাতাসের তাপ লাগে। না, না, লাভা নয়, গলিত স্বর্ণও হতে পারে—এ তো ফিরিয়ে দেবার নয়, এতে যে আনন্দ আছে, এর যে মূল্য আছে। আমি জানি, এ ছাই হয়ে যাবে না, কারণ, 'ছাই হয়ে গিয়ে, তবু বাকি যাহা রহিবে' এ সেই অবশিষ্ট।

তবু আজ দুদিন থেকে কী কষ্ট, কী ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি আমি। কি রকম কষ্ট? 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' যে রকম মন ব্যাকুল হয়, জননান্তর সৌহৃদানি মনে পড়ে—'পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ' সেই রকম কি? তাও তো নয়, এ তো জন্মান্তরের কথা নয়—এ তো এই সে দিনের কথা, মাত্র বেয়াল্লিশ বছর আগের কথা। মাত্র বেয়াল্লিশ বছর আমি পার হয়ে ফিরে গেছি—মানুষেব কাছে এ অনেক সময়, কিন্তু অনন্তের কাছে?

সময়ের তো অবস্থান নেই, তার সামনেই বা কি, পিছনেই বা কি, পাশেই বা কি? তার উদয় অস্ত কোথায়—শুধু আমার সম্বন্ধে অনাদি অনন্ত মহাকাল খণ্ডিত—শুধু আমাকে প্রকাশের জন্য সে সীমাবদ্ধ, কিন্তু আজ হঠাৎ বেয়াল্লিশ বছরের গণ্ডী সে তুলে নিয়েছে—আমি মহাকালে অনুপ্রবিষ্ট—আমার সামনে পিছনে নেই—আমি স্থির ধ্রুব দাঁড়িয়ে আছি এই ১৯৭২-এ পা রেখেও ১৯৩০ সালে।

ঘটনাটা ঘটল কি করে, ঘটল কোন তারিখে?

১৯৭২ সালে ১লা সেপ্টেম্বর সকালে। আগের দিন আমার ছেলেবেলার বন্ধু গোপাল আমাকে ফোন করে বললে, "অমৃতা, তোমার ইউক্লিডকে মনে আছে?"

"হ্যাঁ, একটু একটু—কেন?"

"ওদের দেশ থেকে একজন ভদ্রলোক এসেছেন, তার পরিচিত, ইউক্লিড তোমার বাবার ছাত্র, তা তিনি তো আর নেই, তাই তোমার সঙ্গেই এ ভদ্রলোক দেখা করতে চান।"

একটা ছোট্ট আনন্দের বিদ্যুৎ আমার শরীর মনের ভিতর এক মুহূর্তের জন্য ছুঁয়ে গেল।

গোপাল টেলিফোনের ওপার থেকে তাড়া দিচ্ছে—"চুপ করে কেন? ওকে নিয়ে আসব?"

"ন্-না আমিই যাব, ওর ঠিকানাটা দাও।"

সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। কোনোমতে একটা ট্যাকসি জোগাড়

করে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হলাম। ভাবছি কেন বা এলাম! যে চিঠি লিখলে উত্তর দেয় না, তার খবর জেনে আমার কি হবে? কিন্তু কৌতূহল ছাড়তে চায় না। আমি ভাবছি আমি কৌতূহলী, পরিচিত একজনের খবর জানতে চাওয়া খুব কি অন্যায়?

সত্যভাষণের খাতিরে বলতেই হবে সাধারণ মেয়ের মতো আমি একটু সেজেও নিয়েছি, একটা ভালো কাপড় পরেছি। তবু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বড় দুঃখ হচ্ছে, চেহারাটা বড়ই খারাপ হয়ে গেছে। মহাকালের দাপটে কিছুই থাকে না—সব ভেঙ্গে চুরে জীর্ণ করে দেবে—কিন্তু তাই কি? কাল কি শুধু পুরানোই করে, নূতন করে না? চেহারাটা আমার পুরানো হয়ে গেছে বটে, কিন্তু মন? যে-মন আজ মির্চা ইউক্লিডের কথা জানতে চাইছে—সেই কৌতূহলী উৎসুকী মন নূতন, এও কালের সৃষ্টি। একদিন লিখেছি—

"যে কাল পিছনে ছিল
সে কাল সমুখে ফিরে আসে—
অনবগুণ্ঠিত মুখে তারকাখচিত পট্টবাসে—
কে তারে ভূষণ দিল, দিল অলঙ্কার
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের বসন্তবাহার?
স্পর্শহীন স্রোতে তার রূপহীন আবেগে অতুল
কে ফোটাল ফুল?
শূন্যের সমুদ্র হতে নিমেষে নিমেষে ধরে কায়া—
বেলাহীন বেলাতটে তরঙ্গের মৃত্যুময়ী মায়া।"

যখন লিখেছিলাম তখন জানতাম না পিছন কি করে সামনে আসে—পুরানো নূতন হয়, বা নূতন পুরানো বলে ভাবাটাই একটা ভ্রম মাত্র!

গাড়িতে বসে আমি হাসছি—আমার বেশ মজা লাগছে, কাণ্ডটা দেখ, আমার সাজবার দরকার কি ছিল? চেহারা নিয়েই বা আক্ষেপের কারণ কি? মির্চা ইউক্লিডের সঙ্গে তো আর আমার দেখা হচ্ছে না, দেখা হবে তার দেশের একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে!

দরজাটা খোলাই ছিল। লোকটি টেবিলের উপর ঝুঁকে লিখছিল। তার রঙ তামাটে, ইয়োরোপীয়দের মতো সাদা নয়, শরীর নাতিদীর্ঘ, মুখে বুদ্ধির ছাপ। আমার সাড়া পেয়ে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, "আমি সেরগেই সেবাস্টিন।"

তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার ডান হাতখানি ধরে তার পল্লবের উপর চুম্বন করলে, এ ওদের দেশের রীতি। এই অতি পরিচিত ভঙ্গী যেন বহুবিস্মৃত যুগের পদশব্দের মতো মনে হল।

"তুমি অমৃতা ?"

আমি জানি এই বিদেশী ব্যক্তিটি যার কথা বলছে, আমার দিকে তাকিয়ে যাকে সে দেখছে, সে আজকের ১৯৭২ সালের অমৃতা নয়। যে বিস্ময় তার ঐ ক্ষুদ্র প্রশ্নে ধ্বনিত, সে আজকের অমৃতাকে দেখে জাগবে না। আজ তার মুখে বলিরেখা, চুলে সাদা রঙ, দেহ সৌষ্ঠবহীন, ও দেখছে স্থির দৃষ্টিতে, আমাকে পার হয়ে সে দেখা চলে গেছে বহুদূর, ও দেখছে ১৯৩০ সালের অমৃতাকে।

"তুমি আমাকে চেন ?"

"তোমাকে আমাদের দেশে সবাই চেনে, তুমি আমাদের দেশে রূপকথার নায়িকা।"

"কেন মির্চার বই ?"

"হ্যা, ওর বই। সে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, তোমার বাবা দিলেন না, তোমরা হিন্দু—সে ক্রিশ্চান।"

"বাজে কথা।"

"কি বাজে কথা ?"

"হিন্দু-ক্রিশ্চান ওসব কিছু নয়। তাঁর দম্ভ।"

"আজ বেয়াল্লিশ বছর হয়ে গেল—মাঝে মাঝে শুনেছি ঐ বইয়ের কথা কিন্তু কখনো কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি ঐ বইটি কি—উপন্যাস, কবিতা না প্রবন্ধ —আজকে বলো তো বন্ধু—ঐ বইতে কি আছে ?" প্রশ্নটা করে আমি হাসছি। এইতো কত সহজে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম, এতোদিন করি নি কেন ? ওতো আর এক অমৃতা। চল্লিশ বছর আগেকার মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি ? তার কর্মফল আমাকে কি আর স্পর্শ করে ? বারো বছর পরেই তো আর খুনের অপরাধে দণ্ড হয় না। আমার লজ্জাই বা কেন ? লজ্জা এইজন্য যে, আমি মরালিস্ট। ন্যায়-অন্যায় উচিত-অনুচিত নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, আমি কঠিনভাবে বিচার করি। দুর্বলতার প্রশ্রয় দিই না। আমার বন্ধুরাও আমার সামনে তাদের দুর্বলতার গল্প বলে না। আমি সম্মানের উচ্চাসনে বসে আছি, নিজেকেও তো কোনোদিন রেহাই দিই নি। যখনই মির্চার কথা মনে হয়েছে তখনই ভ্রূকুটি করেছি নিজেকে। কেন এমন একটা ঘটনা ঘটল, না ঘটলেই তো ভালো ছিল—তখনই লজ্জা, বিষম লজ্জা আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে,

ওর স্মৃতিকে অবচেতনের গভীরে নির্বাসন দিয়েছি। কিন্তু আজ কত সহজে একে জিজ্ঞাসা করলুম ঐ বইটার কথা। মনে কোনো সংকোচ নেই।

সেরগেই বললে, "ও বই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস—" লোকটি ভালো ইংরেজি বলতে পারে না, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে থেমে থেমে বলতে লাগল গল্পটা।

"জানো, ঐ বইতে ভারতবর্ষকে জেনে, কলকাতাকে জেনে, আমাদের দেশের লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল।" ওর গলা শুনছি আর পরিচিত নামগুলি মনে পড়ছে, বুকে একটু একটু করে ধাক্কা লাগছে। যেন একটা একটা করে খড়খড়ি খুলছে—ঘরের ভিতর অন্ধকার, কিন্তু জানি ওখানে কি আছে। ওখানে ঢুকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু ভয়ে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে।

"সেরগেই, সত্য বলো ঐ বইতে আমার কথা কি আছে?"

ও মৃদু মৃদু হাসছে, তারপর ওর কন্টিনেন্টাল উচ্চারণে 'ত'-এর আধিক্য দিয়ে ও বললে, "ফাস্ত শী লাভদ্ এ ত্রি—first she loved a tree."

আমি চমকে উঠেছি। বুকের ভিতর দপ্ করে একটা স্মৃতির দীপ জ্বলে উঠল। ঠিক, ঠিক, ঠিকই।—"আরো বলো সেরগেই, এমন কি কিছু আছে যাতে আমি লজ্জা পাব?"

সেরগেই মাথা নিচু করে বললে, "সে লিখেছে রাত্রে তুমি তার ঘরে আসতে। অবশ্য আমি তো এতে লজ্জার কিছু দেখছি না।"

আমি তো স্তম্ভিত—"কী সর্বনাশ! কী অন্যায়! বিশ্বাস কর সেরগেই, এ সত্য নয়, একেবারে সত্য নয়।"

ও আমাকে সাহস দিচ্ছে, "তা বোঝা যায়, তাই তো তোমায় বর্ণনা করতে পারে নি, লিখেছে তুমি অন্ধকারে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছ—ওর তো উপায় ছিল না, ওর যে তখন বড় কষ্ট।"

আমি অসহায় বোধ করছি, যেন জলে পড়েছি। অপ্রিয় সত্যকে গ্রহণ করবার জন্য মনকে প্রস্তুত করতে পারি কিন্তু অপ্রিয় মিথ্যার আঘাত তো অসহনীয়।

অ্যাশ-ট্রেতে সিগারেটটি নির্বাপিত করে এই ভালোমানুষ বিদেশী ব্যক্তিটি বললে, "ক্ষমা কর, আমি তোমার সবটা বললাম, সত্য কথাই বলতে হল।"

"বলতে পার সেরগেই, কেন সে আমার নাম করে বইটা লিখেছে?"

"তোমার নামের বন্ধন সে এড়াতে পারে নি, তখন যে তার কষ্ট, বড় কষ্ট—তুমি বইটা পড়লে চোখের জলে ভাসবে।"

"তাই বলে এমন একটা মিথ্যা কলঙ্ক দেবে?"

"ওটা তার কল্পনা, তখন তার যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধারের ঐ একটাই পথ

তোমার হাতের লেখা, তুমি লিখেছ—Mircea Mircea Mircea—I have told my mother that you have only kissed me on my forehead—"

সেরগেই-র মুখের কথাটা শেষ হয় নি—আমার পায়ের তলা শির শির করে উঠল। আমি একটা নিচু চৌকিতে বসে মাটিতে পা ছুঁয়েছিলাম—আমার মনে হল আমার পা আর মাটিতে নেই—এ ঘরের ছাত নেই। আমি শূন্যে মহাশূন্যে চলেছি—অথচ আমি জানি আমি সেরগেই-র দিকে তাকিয়ে আছি, সে মৃদু মৃদু হাসছে, আমিও হাসছি—কিন্তু কী আশ্চর্য সেই শারীরিক অনুভূতি—আমি দ্বিধাবিভক্ত! আমি এখানে, অথচ এখানে নেই। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি ভবানীপুরের বাড়ির দোতালার বারান্দায়—বারান্দার মেঝেটা সাদা কালো চৌকো চৌকো পাথরে বাঁধানো, যেন সতরঞ্চ খেলার ছক, মসৃণ পাথরের মেঝের উপরে আমি উপুড় হয়ে আছি। আমার হাতে ঐ বইটা। ঐ তো আমি, ঐ তো আমি—আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি, আমার বুকের মধ্যে হঠাৎ জলপ্রপাতের শব্দে সেদিনের কান্না ফিরে এসেছে—কি আশ্চর্য, আমি কিন্তু সেরগেই-র সঙ্গে কিছু একটা কথা বলছি। সে তার পরিষ্কার উত্তর দিচ্ছে। আমার হাত চেয়ারের হাতলে কিন্তু আমি সেই পাথরের মেঝের মসৃণ স্পর্শ পাচ্ছি—আমার সামনে খোকা দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার নোংরা নখওলা পায়ের আঙুলগুলো দেখতে পাচ্ছি—ময়লা ধুতির একটা অংশ মাটি ছুঁয়ে আছে। এটা তো একটা সকাল! বোধ হয় ২০শে সেপ্টেম্বরের সকাল। ১৮ই সেপ্টেম্বর মির্চা চলে গেছে। খোকা আমায় বলছে, আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি—"রু তাড়াতাড়ি লিখে দাও ভাই"—তারপর একটা মুখভঙ্গী করে ফিস্ ফিস্ করে বলছে, "চারদিকে স্পাই ঘুরছে" এটা ও ঠাট্টা করে বলছে, ও খুব মজা করতে পারে, হাসাতে পারে।

খোকা আমাদের কেউ নয়। কিন্তু ভাইয়ের মতো। ওরা বড় দরিদ্র, ওর মাকে আমার ঠাকুমা মানুষ করেছেন। তারপর তাঁর বিয়ে দেন। খোকার মাকে তাই আমরা পিসিমা বলি। পিসিমার আঠারটি সন্তান, তাই ওদের দারিদ্র্য কোনোদিন গেল না। খোকা আর তার বোন শান্তি আমাদের আশ্রিত। যদিও তাদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব, আমরা বন্ধু, খেলার সঙ্গী—তবু ওদের মর্যাদা নেই—আশ্রিতদের যেমন কপাল, দাক্ষিণ্য পেলেও মর্যাদা পায় না। এমন কি মির্চাও ওর উপর সন্তুষ্ট নয়। সেটা অবশ্য অন্য কারণে—কারণ খোকা আমাকে হাসায়। ও সামান্য বিষয়কে এমন করে বলে, এমন মুখভঙ্গী করে যে

চোখ বুজে চেয়ারে পড়ে আছি। কি চাই আমি? কিছু না, কর্ম, সমাজসেবা, দেশের উন্নতি জাহান্নামে যাক্, কিছু চাই না—নিয়ে চল সেই ১৯৩০ সালে আর একবার ওকে দেখব। মির্চা, মির্চা, মির্চা!

হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, লেখা আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—"মা আপনার কি চোখে আবার কষ্ট হচ্ছে? জল ভরে আছে কেন? ওষুধ দেব?"

"হ্যাঁ দাও।"

জন্মদিনের বিপজ্জনক সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। নিজের কৃতিত্বে আমি খুশি। আমি নূতন শাড়ি পরেছি, ফুলের মালা পরেছি, কবিতা আবৃত্তি করেছি, গান শুনেছি, কেউ কিন্তু বুঝতে পারে নি আমার ভিতরটা সর্বক্ষণ কিরকম থরথর করে কাঁপছে! এ কথাটা উপমা দিয়ে বলা নয়—সেই কম্পন যদি শরীরে দেখা যেত লোকে মনে করত আমার পারকিনসন্স রোগ হয়েছে।

রাত্রি দুটোয় বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি—এখন ভোর হয়ে এল। তারাগুলো একদিক থেকে অন্যদিকে চলে গেছে। এ বাড়িতে ছাতে ওঠা যায় না, এই এক বিপদ। ভালো করে আকাশ দেখতে পাই না। আমি চিরদিন আকাশের নিচে শুয়ে থাকতে ভালোবাসি। মির্চাও ছাতে বেড়াতে খুব ভালোবাসত। প্রথম দিন ছাত দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।

"জানো আমাদের দেশে ছাতে ওঠা যায় না?"

"সে আবার কি! তোমরা সূর্য তারা দেখ কি করে!"

"সূর্য তারা দেখে অ্যাস্ট্রনমাররা, সাধারণ লোকে সে কথা ভাবেই না।"

"আমাদের দেশে লোকে সকালে প্রথমেই সূর্য প্রণাম করে।"

"তুমি কর?"

"আমার সূর্য ভিতরেও আছে বাইরেও আছে। আমি সব সময়ই প্রণত। সকাল-বিকাল নেই।"

"তার মানে? বলো, বলো, হাসছ কেন, বলতেই হবে।"

"না বলব না। তুমি বুঝবে না।"

"তুমি আমায় অপমান করছ—বুঝতেই পারব না?"

"বলতেই হবে ভিতরের সূর্য কে।"

"আমার গুরু। তিনিই আমায় এই সুন্দর পৃথিবীটা দেখাচ্ছেন।"

"তিনি কি শুধু নিজেকেই দেখান, না আরো কিছু দেখান?"

"সমস্তই দেখি তাঁরই আলোকে।"

"যেমন?"

"যেমন এই তোমাকে দেখছি।"

ও সেদিন খুশি হয়েছিল—"আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে হুইটম্যান পড়বে?"

"হুয়্ অত নীরস লেখা বুঝতেই পারি না। তার চেয়ে শেলী পড়ব—সেন্‌সেটিভ প্ল্যাণ্ট।"

যাই গিয়ে শুয়ে পড়ি। কাল কত কাজ আছে—বিকালে মিটিং আছে। বিয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে করে লাভ কি! কোথায় বা সে মির্চা, আর সে কোন্ অমৃতা, দেখলে হয়তো চিনতেই পারব না কেউ কাউকে!

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই আমার বর্তমানে স্থির থাকতে পারছি না। বারে বারে কখনো দিনে কখনো রাতে আমি ফিরে ফিরে চলে যাচ্ছি ভবানীপুরের বাড়িতে, ১৯৩০ সালে।

আমার মনে পড়ে না সেটা কোন মাস যে-দিন মির্চা ইউক্লিড প্রথম আমাদের বাড়ি এল, অর্থাৎ আমি প্রথম লক্ষ্য করলাম তাকে। আমার বাবা পণ্ডিত ব্যক্তি, মাত্র ছয় বছর আগে তিনি পূর্ববঙ্গের একটা মফঃস্বল কলেজে অধ্যাপনা করতেন, তারপর কলকাতায় এসেছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কলকাতা শহরে বিদ্বৎ-সমাজে সম্মানের উচ্চচূড়ায় পৌঁছে গেছেন। সবাই তাঁকে চেনে। তিনি পণ্ডিত এবং অসাধারণ পণ্ডিত। সেজন্য অনেকেই তাঁকে ভয় করে, ঐ পাণ্ডিত্যের একটা আক্রমণকারী রূপ আছে। যে কোনো ব্যক্তিকে অল্প সময়ের মধ্যে বিতর্কে হারিয়ে তাকে মূর্খ প্রতিপন্ন করে দিতে পারেন এবং এ খেলায় তিনি বেশ আনন্দ পান। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর আকর্ষণী শক্তি অদ্ভুত। তিনি যাদের অপমানিত করেন তারাও তাঁর কাছ থেকে পালায় না। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর জন্য অনেক ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তিনিও তাঁদের ভালোবাসেন কিন্তু সে ভালোবাসা আমাদের সাধারণ মানুষের ভালোবাসার মতো নয়। তাতে অপর পক্ষের প্রতি সমবেদনা নেই। ভালোবাসাটা তাঁর নিজের জন্যই, যেমন আমাকে ভালোবাসেন, খুবই ভালোবাসেন, সেটা আমার জন্য যত না তত নিজের জন্য—এই ছাখো আমার কন্যাটি কী অমূল্য রত্ন, দেখতে কী সুন্দরী, কী চমৎকার কবিতা লেখে, কী সুন্দর ইংরেজী বলে—এ তো আমার মেয়ে, ছাখো ছাখো তোমরা! আমাকে নিয়ে মেতে আছেন বাবা। কিন্তু জানি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু নড়লে আমাকে চূর্ণ করে দিতে তাঁর বাধবে না। আমি কিসে সুখী

হব সেটা তাঁর কাছে অবান্তর।

আমার মা একেবারে বিপরীত। আমার মা পরমাসুন্দরী। ঐ সময়ে তাঁর সৌন্দর্য অলৌকিক, স্বর্গীয়। তাতে বাবা খুব গর্বিত কিন্তু মার কোনো খেয়ালই নেই—মা কোনোদিন প্রসাধনে যত্ন করেন না, নিজের কোনো সুখস্বাচ্ছন্দ্য, ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই বললেই হয়। বাবাকে সুখী করাই তাঁর একমাত্র কাজ। সেই কাজে বাবা তাঁকে যথেষ্ট ব্যাপৃত রাখেন—বিশেষ করে সামান্য একটু অসুখ করলে হৈ চৈ করে এমন অবস্থা করে তোলেন যে মার মনে সর্বদা ভয় এই বুঝি তাঁর স্বামীর ভয়ানক একটা কিছু হল। মা বৈষ্ণবসাহিত্য পড়তে ভালোবাসেন, দুটো লাইন তিনি প্রায়ই বলেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।

শুধু যে স্বামীকে প্রীত করবার ইচ্ছা তা নয়। চার পাশের প্রত্যেকটি লোকের জন্য মায়া-মমতার সুধাপাত্র মার হাতে ভরাই আছে।

সে সময়ে আমাদের বাড়িতে সর্বদা বিদেশীরা যাতায়াত করতেন। নানা বিষয়ে আলোচনা হতো, যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে বিদুষী স্টেলা ক্রামরিশ ও অধ্যাপক তুচির কথা সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে, ফর্মিকিও বোধ হয় এসেছিলেন। অধ্যাপক তুচি পরে ভালো বাংলা শিখেছিলেন—তাঁকে দেখতে ছাত্রের মতো ছিল—কচি মুখের উপর অবাধ্য চুলগুলো কপালে এসে পড়ত বার বার। তাঁর স্ত্রী বেশ চৌকো চৌকো চেহারা, গলায় মুক্তার মালা। তাঁদের আসা-যাওয়ার জন্য বাড়ির চেহারা ক্রমে বদলে যাচ্ছিল। বাঙ্গালীয়ানার উপর সাহেবিয়ানার ছোঁয়াচ লাগছিল। বছরখানেক আগে আমার ঠাকুমা মারা গিয়েছিলেন তাই এই উন্নতি সম্ভব হয়েছিল, নইলে হতো না। বেশ মনে আছে ১৯২৪ সালে প্রথম যেদিন খাবার ঘরে বিরাট মেহগনি টেবিল এল, ঠাকুমা অনেকক্ষণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, তাঁর হাতের সোনার জপের মালা থেমে গিয়েছিল—"কী, এর উপর খাওয়া হবে কেন? শুলে কি দোষ হয়? এটা তো একটা খাট-ই!" তারপর যখন দেখলেন কোনো উপায় নেই, কথা টিঁকবে না, তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই।' তিনি পারতপক্ষে ও-ঘরের কাছেও যেতেন না। আর যেদিন কাঁটাচামচ দেখলেন, সেদিনের কথা ভুলব না, ভ্রূকুটি করে মাকে বললেন, 'ভাত খাওয়ার জন্য অতগুলো যন্তর লাগবে।' প্রতিশোধস্পৃহা এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে প্রায়ই আশা প্রকাশ করতেন যে ঐ কাঁটা দিয়ে 'জেহ্বাটা' এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হলে তবে শিক্ষা হয়! ঠাকুমার সংস্কারগুলো যে

কত অনড় আর তাঁর পক্ষে কত সত্য তা তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় দেখিয়ে গিয়েছেন। কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে তিনদিন ভুগে তিনি মারা যান। প্রথম দুদিন মা সমস্ত সেবাটা করলেন, কাকা তাঁকে সাহায্য করলেন। মা তখন গর্ভবতী ছিলেন—ডাক্তার খুব রাগ করতে লাগলেন, শেষপর্যন্ত বাবাকেও বকাবকি শুরু করলেন, অবশেষে মাকে সরে যেতে হল—নার্স এল, ক্রিশ্চান নার্স। তাকে শিখিয়ে দেওয়া হল ঠাকুমা জাত জিজ্ঞাসা করলে বলবে 'ব্রাহ্মণ'—।

রুগী অর্ধঅচৈতন্য চোখ ঈষৎ উন্মীলিত করে বললেন, "জল"—নার্স জল নিয়ে এগিয়ে এল—"এই যে জল খান, মুখ খুলুন"—মুমূর্ষু নারী মুখ খুললেন না, চোখ খুললেন, তাঁর মৃত্যুআচ্ছন্ন কানে গলার স্বরটা অপরিচিত ঠেকেছে, "তুমি কে মা?"

"আমি নার্স।"

"আচ্ছা থাক একটু পরে জল খাব।" কলেরা রোগাক্রান্ত রুগীর মুহুর্মুহু তৃষ্ণা। তিনি আবার বললেন—"জল"···

"এই তো জল এনেছি খান", ফিডিং কাপটা এগিয়ে ধরেছেন নার্স—

"আমার বৌমাকে ডেকে দাও"—

"তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আমার কাছেই জল খান না।"

"তুমি কি জাত?"

"ব্রাহ্মণ।"

"সধবা না বিধবা—"

"বিধবা"—এবারে মৃত্যুপথযাত্রিনী ভালো করে তাকালেন, ইনি সব জানেন—তাঁর কি রোগ, রোগের গতি কি, এখন কি অবস্থা কিছুই তাঁর অজ্ঞাত নয়—কারণ তিনি কবিরাজ বাড়ির বধূ—চিকিৎসকদের সঙ্গেই জীবনের অনেক দিন কেটেছে। "ছাখো নার্স আমার পেট ফেঁপেছে, কলেরা রুগীর পেট ফাঁপলে আর বাঁচে না—" মুমূর্ষু রুগীর এখন টনটনে জ্ঞান ফিরে এসেছে। কোমা-র ব্যাপারই ঐ, মাঝে মাঝে রুগী সজাগ হয়ে যায়। "ও নার্স তুমি খেয়েছ ত? কি দিয়ে ভাত খেলে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো মাছের ঝোল ভাত খেয়ে এসেছি।"

আর বলতে হবে না, যা সন্দেহ হয়েছিল তার নিরসন হল, "ছাখো নার্স, তুমি ব্রাহ্মণের বিধবা, মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে এসেছ, মৃত্যুকালে তুমি আর আমার মুখে জল দিও না মা, আমার বৌমাকে ডেকে দাও।"

বৌমাও ছুটে এলেন, "সারাজীবন ওঁর সেবা করলাম। আর এখন এই শেষ সময়ে মনোকষ্ট দেওয়া—আমার যা হয় হবে।"

ঠাকুমা চলে যাবার পর এ বাড়ির চেহারা বদলে গেল ভিতরে ও বাইরে। ব্রত পূজা, কালীঘাট, পুরোহিত, ছুঁৎমার্গ, এঁটো প্রভৃতি বিরাট বিরাট সমস্যা যা সারাদিন মাকে হয়রান করত, সব যেন এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত জঞ্জালের স্তূপ সরিয়ে আমরা নূতন দিগন্তের দিকে মুখ ফেরালাম।

আমার এ পরিবর্তন খুব ভালো লাগছিল। আমি শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে যতই এগোচ্ছি ততই ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের দেখতে পাচ্ছি। আমাদেব মফঃস্বলের বাড়িঘরের চেয়ে এঁদের বাড়ি-ঘর আচার-আচরণ কত না পৃথক! তখন একটা কথা শুনতাম, 'এলিট' এখন যেমন শুনি 'বুর্জোয়া'। 'বুর্জোয়া' কথাটার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আছে, কেমন যেন ঝগড়ার আভাস পাওয়া যায়, 'এলিট' তা নয়। আরো একটা কথা শুনতাম 'ক্রিম অফ ক্যালকাটা', এখন তো দুধে সরে মিশে একাকার। এই উচ্চ সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমার তের বছর বয়স থেকে বাবা আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতেন, আমি যাতে তাঁকে আমার কবিতা দেখিয়ে নিই সেজন্য। আমি কোনোরকমে সেই কাজটা সংক্ষেপে সেরে তাঁর কবিতা তাঁকে আবৃত্তি করে শোনাতাম, আমি খুব ছেলেবেলা থেকে কবিতা আবৃত্তি করতে ভালোবাসি। আমার মুখে নিজের কবিতা শুনতে রবীন্দ্রনাথ ভালো-বাসতেন। মাঝে মাঝে আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য তিনি বলতেন, "তুমি আমার চেয়েও আমার কবিতা ভালো পড়"—জানি এ কথা আমাকে খুশি করবার জন্যই তবু আমার মন পূর্ণ হয়ে যেত কানায় কানায়, আমি ভাবতাম, এঁর কাছ থেকে আমি কত পাই, এখানে একবার এলে এঁর অস্তিত্বের আস্বাদই কি মধুর—কিন্তু আমার তো ওঁকে দেবার কিছুই নেই। এই একটি জিনিসই দিতে পারি। তাই যদিও সেই বিরাট প্রতিভার সামনে আমার সঙ্কোচ ও লজ্জার অন্ত ছিল না, অনেক সময় মুখ তুলে কথাও বলতে পারতাম না, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে আমার লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচ কেটে যেত। মনে আছে একবার 'সোনার তরী', 'কৌতুকময়ী', 'জীবন দেবতা', 'হৃদয় যমুনা' আবৃত্তি করছি পর পর—উনি মৃদু মৃদু হাসছেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এসব কবিতা তুমি বুঝতে পার?"

আমি খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘাড় নাড়লাম 'হ্যাঁ'—তারপর সোনার তরীর নিহিতার্থ, জীবন দেবতার দর্শন, বাবার কাছে যেমন যেমন শুনেছিলাম গড় গড় করে বলতে শুরু করলাম—উনি আমায় মধ্যপথে থামিয়ে দিলেন। আমার কচি-

মুখে উচ্চ দর্শনশাস্ত্র কি রকম শোনাচ্ছিল এখন বুঝতে পারি। উনি বললেন, "থাক থাক, তুমি শুধু পড়—যখন সময় হবে, অর্থ আপনি বুঝতে পারবে। পাখি যে গান গায় তারও কোনো অর্থ আছে বিশ্ব ব্যাপারে, সে কিন্তু সেটা জানে না। তাতে ক্ষতি নেই, তেমনি মনের আনন্দে তুমি পড়, অন্যের ব্যাখ্যা তোমার কোনো কাজে লাগবে না।"

এ সময় একজন রুশ পণ্ডিত প্রায়ই আসতেন, তাঁর নাম আমার মনে পড়ে না, হয়তো তিনিই বগদানভ—শান্তিনিকেতনে যেসব বিদেশী পণ্ডিতব্যক্তি আসতেন যাবার আসবার পথে তাঁরা একবার আসতেনই আমাদের বাড়িতে। শাস্ত্র-আলোচনায় আমি সাহসের সঙ্গে যোগ দিতাম। তত্ত্বচিন্তার একটা আবহাওয়া, সেটা আমার মত অল্পবয়সীদের কাছে একটা কুয়াশা ছাড়া কিছু নয়—কিন্তু সেই প্রহেলিকাময় নীহারিকা আমার ভালো লাগত। সেই নীহারিকা ভেদ করে সূর্যের আলো অবশ্যই আমাকে উত্তপ্ত ও সজাগ করে রাখত। এক দিকে ব্যক্তিমানুষের জীবন্ত অনুভবের সত্য শিল্পের বেদনায় ঝঙ্কৃত, অন্য দিকে এক নিরন্তর অনন্ত জিজ্ঞাসার প্রহেলিকা আমার সেই উন্মুখ সতেজ নবীন মনের উপর আলোছায়ার খেলা করছিল। আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের পরিবারের থেকে আমাদের বাড়িটা ছিল স্বতন্ত্র—আর আমার সমবয়সীদের কাছে, বিশেষত স্কুলের সহপাঠীদের কাছে আমি ছিলাম দুর্বোধ্য। তারা আমায় ক্ষেপাতো আমি অন্যমনস্ক বলে। অন্যমনস্ক, অর্থাৎ যখন যেটাতে মন দেবার কথা সেটা ছেড়ে অন্য কিছু ভাবতাম।

আমাদের সময়ে ছেলেমেয়েদের মেশামেশি কম ছিল তবু আমরা পর্দানশীন ছিলাম না। আমার মা, বাবার সহকর্মীদের সামনে সব সময় না বেরুলেও ছাত্রদের সামনে বেরুতেন—আমি তো সকলের সামনেই বেরুতাম। মফঃস্বলে থাকতে মাকে দেখেছি চিকের আড়ালে বসে বসবার ঘরের সাহিত্য-আলোচনা শুনতেন ও আড়াল থেকে জলখাবার পান শরবৎ পাঠিয়ে দিতেন। কলকাতায় এসে সে আড়াল উঠে গেল। আমরা সর্বত্র যেতাম। সাহিত্যসভায় কবিতা আবৃত্তি করতাম, যেখানে একটিও মেয়ে নেই। এতটা তখনকার দিনে খুব কম মেয়েই করেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমাদের মুখের উপর একটা অদৃশ্য ঘোমটা থাকত। আমরা সহজে কারুর সঙ্গে কথা বলতাম না। হয়তো বাবার কোনো ছাত্র তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে এল, আমি মাথা নিচু করে হাঁটতাম, তার সঙ্গে কথা বলতাম না। সত্য কথা বলতে কি আমরা পর্দাবিহীন পর্দানশীন ছিলাম। কথা বলতে ইচ্ছে করত না তা নয়, খুবই করত,

আমি জানতাম অপর পক্ষেরও তাই। তবে কথা বলতে বাধা কি? কেউ তো আর আমাদের বারণ করেনি। কিন্তু আমরা পারতাম না। আত্মীয়স্বজন ছাড়া অন্য পুরুষ মানুষদের সামনে, বিশেষতঃ যুবকদের সামনে আমরা একেবারে পাথর হয়ে যেতাম। তারাও তাই। যেন কেউ কাউকে দেখতেই পাচ্ছি না। কত যুগযুগের সঞ্চিত নিষেধের প্রভাব আমাদের রক্তস্রোতে বইছে, একে পার হওয়া দুষ্কর, কিন্তু আজকের দিনে কেউ হয়তো বিশ্বাসই করবে না যে এই নিষেধটা কেন, এর ভিতরের কারণটা কি সে সম্বন্ধে আমরা, অন্তত আমি বিশেষ কিছু জানতাম না। এই সব শিক্ষিত উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে যৌন ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হতো না। আভাসে ইঙ্গিতে, একটা ঢাকনা পরা লুকানো জগৎ আছে, সেটা অবশ্যই আমরা বুঝতাম কিন্তু সেখানকার ব্যাপারটা কি তা জানা ছিল না। আমাদের বেছে বেছে উপন্যাস পড়তে দেওয়া হতো। বিশেষ বিশেষ কতগুলি বিখ্যাত বই একেবারে নিষিদ্ধ, তার মধ্যে 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চোখের বালি' ও 'চরিত্রহীন'। 'নৌকাডুবি' পড়বার অনুমতি ছিল। 'নৌকা-ডুবি'র মলাটটা খুলে নিয়ে 'চোখের বালি'তে লাগিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম। অবশ্য কেন বইটা এত নিষিদ্ধ তা বুঝতে পারিনি।

যদিও বাবার বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে বেশি কথা বলার সাহস হতো না কিন্তু বিদেশী ছাত্রদের সম্বন্ধে অন্তরে এ-বাধা অনুভব করতাম না। বাবাও অনায়াসে ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মিশতে দিতেন। এই সময়ে এক রুশ-দম্পতি কলকাতায় এসেছিল। তারা গ্লোবে নানারকম জাদুবিদ্যা দেখাচ্ছিল। তাদের নিয়ে সহরে খুব সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বাবা বললেন, "চল, বুজরুকিটা দেখে আসি"—গ্লোব থিয়েটারে স্টেজের উপর চোখে কালো রুমাল বেঁধে আভূমিলুণ্ঠিত কালো গাউন প'রে একটি সুন্দর মহিলা এসে দাঁড়াতেন, আর তাঁর স্বামী দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে নেমে আসতেন। ভদ্রমহিলা দর্শকদের বলতেন প্রশ্ন করতে। দর্শকদের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে উঠে কেউ প্রশ্ন করলে তাঁর সুবেশ তরুণ স্বামী সেই ব্যক্তির নাড়ি ধরতেন, তখন মহিলাটি স্টেজের উপর থেকে তাঁর অনুচ্চারিত প্রশ্ন এবং উত্তর গড়-গড় করে বলে যেতেন। প্রশ্নগুলো কখনো ঠকাবার জন্য করা হতো, কখনো বা কোনো মর্মান্তিক গোপন খবর জানবার জন্য। যেমন, একজন উঠে দাঁড়াতেই চোখবাঁধা মহিলাটি বললেন, 'তুমি জানতে চাও তোমার পকেটে যে দেশলাইয়ের বাক্সটা আছে তাতে ক'টা কাঠি আছে ?—বাহান্নটা !' কিংবা 'তুমি জানতে চাও তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী কি না ? তিনি তো ঠিকই আছেন, তুমিই অবিশ্বাসী—' এই না শুনে সারা ঘরসুদ্ধ লোকের উচ্চ হাসিতে ভদ্রলোক

অপ্রস্তুত। বাবা বললেন, "এই মেয়েটা তো জাহাঁবাজ, একে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।"

আজকাল, অর্থাৎ এই উনিশ শ' শতকের শেষের দিকে এদেশে যে রকম অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের দিকে ঝোঁক হয়েছে উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজেও, আমাদের সময় যতদূর মনে পড়ে এটা কম ছিল। এখন ঘরে ঘরে ছবি থেকে ভস্ম পড়ে, অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্তর আবির্ভূত হয়, এসব গল্প বিদ্বান বৈজ্ঞানিকেরাও সহজে বলেন, তখন তা হতো না। শিক্ষিত লোকেরা কোনো আজগুবি অতি-প্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস করতে ইতস্তত করতেন, অন্তত মনে মনে যাই হোক মুখে তা স্বীকার করতেন না। আমার বাবাও যে একেবারে কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন তা নয়, কিন্তু তাঁর প্রকাশ্য মন তা স্বীকার করত না। অতএব পরীক্ষা করবার জন্য ঐ রুশ-দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করা হল। বাবার ধারণা দর্শকদের মধ্যে ওদেরই লোক ছিল। আমি বললুম, "তাহলে তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে না কেন?"

"বাবারে, যা জাহাঁবাজ মাইয়া, কি জানি কি কইয়া দিব!"

আমাদের বাড়িতে চায়ের বৈঠকে বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি এলেন, অধ্যাপক, লেখক ইত্যাদি, চায়ের সঙ্গে এই মজার খেলা চলতে লাগল। ভদ্রলোক নাড়ি টিপে ধরেন, ভদ্রমহিলা তাঁর মনের কথা বলে দেন। অবশেষে আমার পালা এল, আমি ভাবলাম একটু ফাঁকি দেবার চেষ্টা করা যাক, বাংলা কথা কি করে বলবে? মনে মনে বললাম, "আমার শেষ কবিতাটার নাম কি?" ভদ্রমহিলা ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে বললেন, "ভোগপাত্র"—উচ্চারণবিকৃতি ছিল কিন্তু বলেছিলেন ঠিকই। একজন তরুণ অধ্যাপক বললেন, "থট্‌রিডিং ছাড়া আর কিছু নয়।"

বাবা বললেন, "বেশ, তাতেই সব ব্যাখ্যা হয়ে গেল নাকি!"

এই রুশ-দম্পতিকে নিয়ে আমরা একদিন এম্পায়ার থিয়েটারে ইটালীয়ান অপেরা দেখতে গেলাম। বাবা, মা, আমি ও ওরা দুইজন। সেই সময়ে এ-দেশে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে কান অভ্যস্ত ছিল না—সাধারণত তা শেয়াল কুকুরের চীৎকার বলেই অভিহিত হতো। এখন ট্রানজিস্টারের কল্যাণে বস্তির রোয়াকেও জাজ সঙ্গীত তো বাজছেই, বীঠোভেনও বাজছে। তখন এটা কল্পনাতীত ছিল। দু-তিন পুরুষ ধরে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় তালিম পেয়েছেন, যাঁদের বলা হতো ইঙ্গবঙ্গ সমাজের লোক, তাঁদেরই বাড়িতে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের চর্চা হতো, মেয়েরা টুং-টাং পিয়ানো বাজাতেন—অতিথি অভ্যাগত, বিবাহোপযোগী পাত্র এলে ড্রয়িংরুমে পিয়ানো বাজিয়ে কৃষ্টির পরিচয় দিতেন, কিন্তু

সেটা একেবারে শিশুসুলভ ব্যাপার ছিল। অতএব বোঝাই যাচ্ছে ইটালীয়ান অপেরা আমার কাছে খুব একটা উপভোগ্য হচ্ছিল না। কিন্তু জানি সে কথা কাউকে বলব না, কারণ এই তো সবে এসব জায়গায় আসছি। এতে বড় হয়ে ওঠার গৌরবটা অনুভব হচ্ছে। তাছাড়া নিজেকে বেশ বোদ্ধা প্রমাণ করতেই চাই, অজ্ঞ বলে নয়। যাই হোক, অন্যমনস্কভাবে অপেরা দেখছি যেন ওষুধ খাচ্ছি। হঠাৎ ঐ রুশ ভদ্রলোক, তখন তাকে অ-ভদ্রলোকই বলব, দক্ষিণ হাতটি বাড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। আমি তো আঁতকে উঠলাম। যদিও এসব বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা যথেষ্ট ছিল তবু স্বাভাবিকভাবে আমরা ঠিক মতোই ব্যবহার করতাম। আমি এক ঝাঁকানি দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দিলাম, আবার যেন স্প্রিং-দেওয়া কলের মতো সে ব্যক্তি সেটি ফিরিয়ে আনল। ভাবলুম কি করা যায়—এখানে তো চেঁচামেচি করা যাবে না। নিচু হয়ে পায়ের নাগরাটা খুলে আস্তে আস্তে ওর হাঁটুর উপর রাখলাম, এবার সেও আঁতকে উঠল, আমি খুব ধীরে ধীরে বললাম, "তোমাকে জুতো মারব।" তখন স্প্রিংটা অন্যদিকে কাজ করল, সে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিল। বাড়ি ফিরে এই গল্পটা বলাতে, মা বাবার উপর ভারি রেগে গেলেন, যাকে তাকে এতটা বাড়ির ভিতরে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু বাবা খুব হাসছেন। পাশ্চাত্য জগৎটা তিনি চিনতেন ভালোই, তাই একটুও আশ্চর্য হন নি। মাকে বলতে লাগলেন, "অমৃতাকে নানা অবস্থায় নানা লোকের সঙ্গে মিশতে শিখতে হবে, ও তো তোমার মতো ঘরে বসে থাকবে না। যদি একটু চেষ্টা করে ও একদিন সরোজিনী নাইডু হবে।"

যাই হোক এই কাণ্ডের পরও যে কাজটা তখন মার এবং আমার কাছে ভয়ানক খারাপ এবং অক্ষমনীয় মনে হয়েছিল এবং আমরা দুজনেই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে, বাবা ওদের সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করলেন না। এমন কি রবিঠাকুরের কাছে নিয়ে যাবার যে কথাটা ছিল সেটাও স্থির রাখলেন। আমি তাঁর কাছে এদের জাদুবিদ্যার গল্প করেছিলাম। উনিও এদের দেখবার জন্য ব্যগ্র হয়েছিলেন। অলৌকিক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস না থাকলেও রবিঠাকুর মনে করতেন সব বিষয়েই পরীক্ষা করে দেখবার চেষ্টা করা উচিত। সেটাই বৈজ্ঞানিক। অনুসন্ধান করব না কেন? তাই একটা দিন ঠিক হয়েছিল রুশ-দম্পতিকে নিয়ে যাবার জন্য।

"বাবা, আমি ওদের সঙ্গে যাব না, লোকটা ভারি বিশ্রী—"

"তা কি হয় মা—সব ঠিক হয়ে আছে এখন তুমি না গেলে কবি কি ভাববেন? তাছাড়া জীবনে কত রকম অবস্থায় কত রকম মানুষের সঙ্গে দেখা

হবে, নিজের শক্তিতে বুদ্ধিতে সব সময়ই তুমি ঠিক পথে স্থির থাকবে, এ তো আমি জানিই। জগতে খারাপ লোক আছে বলে কি তুমি গর্তে ঢুকে থাকবে ?"

দুপুরবেলা বাবা ও আমি রুশ-দম্পতিকে নিয়ে কবির কাছে গেলাম—ওদের দোতলার পাথরের ঘরে বসিয়ে আমি তিন তলায় ওঁকে খবর দিতে গেলাম। পাথরের সেই ঘরটা চোখের সামনে ভাসে—নিচু নিচু চৌকিতে গদীগুলি জাপানী মাদুর দিয়ে মোড়া আর কুশনগুলিও জাপানী মাদুরের। ঐ ঘরের পরে বহু পরিবর্তন দেখেছি—ঐ ঘরেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে। উপরে গিয়ে দেখি তিনি তৈরী হয়েই আছেন, একটা কাগজে কয়েকটা প্রশ্ন লিখে নিয়ে কাগজটা বইয়ের মধ্যে পুরে উঠে দাঁড়ালেন, "চল জাদুকরীকে দেখা যাক।" ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে আমরা নেমে এলাম। ওরা অপেক্ষা করছিল, দু-চার কথার পর মেয়েটি চোখে কাপড় বাঁধল, তার স্বামী এসে ওঁর নাড়ি ধরল। মেয়েটি কিছু বলতে পারল না কিন্তু সে যে চেষ্টা করছে বোঝা গেল। কবি তো ওদের অপ্রস্তুত করতে চান না, ব্যাপারটা বুঝতে চান, তিনি বলতে লাগলেন—"কি করলে সুবিধা হবে—আমি যদি কাগজে লিখি সুবিধা হবে ?" মেয়েটি বললে, "হতে পারে।" উনি তখন কাগজে লিখে কাগজটা উল্টে রাখলেন। তবুও কিছু হয় না। মেয়েটির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগল—তারপর বারান্দায় চলে গেল—"There is a wall before me, there is a wall before me—আমার সামনে একটা দেওয়াল, সামনে একটা দেওয়াল—" বলতে বলতে বারান্দায় দৌড়াতে দৌড়াতে আরো জোরে জোরে বলতে লাগল—"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না", তার কপালের ঘাম ঝরে পড়ল, নিঃশ্বাস দ্রুত হল, তারপর ঐ রকম বলতে বলতে ঘরের বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গলি দিয়ে দৌড়ে চলে গেল—ওর হতবুদ্ধি স্বামীও ওর পিছন পিছন ছুটল, চিৎপুরের রাস্তায় সাহেব মেমের এই দৌড় দুপাশের দোকানদারেরা কি রকম উপভোগ করছে ভেবে আমার হাসি পেয়েছিল খুব। আমি মুখে কাপড় দিয়ে হাসছি। বাবা বললেন, "তুই এখানে থাক। আমি ওদের পৌঁছে দিয়ে আসি।" কবি আমাদের পিতা-পুত্রীর বুদ্ধির উপর যথেষ্ট কটাক্ষ করলেন এবং অধ্যাপকদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কি প্রত্যাশা করা যায়, তাও বললেন। এদিকে বাবাও ক্ষুব্ধ, তাঁর ক্ষোভের কারণ ওরা কবির কথা বলতে পারল না, আর তাঁরটা পারল ! রুশ জাদুকরের উপাখ্যান এইভাবে শেষ হল।

এই সব ঘটনা যখন চলছিল, তখন মির্চা ইউক্লিড আমাদের বাড়ি আসত কিন্তু সে সময়ে তাকে লক্ষ্য করি নি। আমার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে বলেও মনে পড়ে না। যেদিনের কথাটা মনে আছে সেটা একটা বিকেল। বাবা তাঁর লেখবার টেবিলে বসেছিলেন। আর উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বাবার দিকে মুখ করে সে বসেছিল। বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন—"এই আমার মেয়ে অমৃতা, এই আমার ছাত্র মির্চা ইউক্লিড"—সে উঠে দাঁড়াল। আমি ওকে এক-পলক দেখলাম। ওর চোখে পুরু চশমা, চুল হালকা, চোয়াল উঁচু, মুখ চৌকো। বিদেশীদের এই অভ্যাসটা আমার খুব ভাল লাগে, মেয়েদের দেখলে ওরা উঠে দাঁড়ায়। আর আমাদের ছেলেরা? হয় তো পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকবে, নয় তো ন্যাকামি করবে, বা এমন ভাব করবে যেন মেয়েদের উপস্থিতি টেরই পাচ্ছে না।

বাবা বললেন, "ইউক্লিড যেখানে থাকে সেখানে ওর খুব অসুবিধা হচ্ছে তাই আমি ওকে এখানে থাকতে বলছি, ওর জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দাও।"

এক মুহূর্তের জন্য আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, আমি বললাম—"বাবা বাড়িতে আবার একজন ইংরেজ কেন?" বাবা আমার আপত্তিতে বেশ একটু বিরক্ত হলেও খুব সাবধানে বাংলায় বললেন—"এ ইংরেজ নয়, ইউরোপের একটা ছোট্ট দেশের মানুষ। আর ইংরেজ হলেই বা কি, এই তোমার শিক্ষা হল?"

এইবার আমি মির্চা ইউক্লিডের দিকে তাকালাম। বিদেশী নাম সম্বন্ধে আমার তখনও কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। নইলে হয়তো নাম শুনেই বুঝতাম যে ওটা অ্যাংলো-স্যাক্সন নাম নয়—যা হোক চেহারা দেখে বুঝলাম এ ইংরেজ নয়। রঙ যদিও সাদা, চুল কালোই, লালচে নয়,—ব্যাকব্রাশ করা, কপালের দুধার দিয়ে উঠে গেছে। গালের হাড় উঁচু, একটু পাহাড়ীদের মতো। সে চকিতে একবার আমার দিকে চেয়ে চোখ সরিয়ে নিল।

আমার আপত্তি অবশ্য ঠিক ইংরেজ বলে ছিল না, কিন্তু এটা বলাই ভালো মনে করে বলেছিলাম। এ সময়ে বিদেশীদের যাতায়াত ও কলকাতার 'এলিট'দের সঙ্গে মেলামেশার জন্য আমাদের বাড়ির সাজগোজ বদলান হচ্ছিল একটু একটু করে। এ বিষয়ে আমিই অগ্রণী ছিলাম, মা এসব একেবারেই পারতেন না। বাবা আর আমি এগবার্ট এণ্ড্রুজ নামে একটা নীলামের দোকান থেকে নিত্য নূতন আসবাব নিয়ে আসতাম। দিল্লী কানপুরের পিতলের জিনিস পালিশ করা, দরজার হাতল থেকে ছিটকিনি পর্যন্ত, আমাকেই করতে হতো। এই বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ আমাদের মতো আধাসাহেবী বাড়িতে যথেষ্ট কষ্টকর

ছিল। একে তো বাড়িতে অনেক লোক, তাছাড়া গ্রাম থেকে যখন তখন গ্রাম্য আত্মীয়স্বজন রোগের চিকিৎসা করাতে, গ্রহণের গঙ্গাস্নান করতে, কালীঘাটে পুজো দিতে উপস্থিত হতো সদলবলে। আমার মা কাউকে ফেরাতেন না। রোগ নিয়ে কেউ এলে মা সুপটু নার্সের মতো তাদের সেবা করতেন। মার নিজের কোনোদিন কালীঘাটে যাবার ইচ্ছা ছিল না। মার বাপের বাড়ি সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন—কিন্তু গ্রামের কোনো বৃদ্ধা আত্মীয়া এলে আমাদের শেভরলে গাড়ি করে প্রতিদিন তাঁকে কালীঘাট পাঠাতেন—গাড়ি করে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল আনতেন। মার দরজা সর্বদা সবার জন্য খোলা থাকত। কিন্তু এর ফলটা আমার পক্ষে খুব ভালো হতো না। কারণ আমি অল্প কিছুদিন হল একলার জন্য একটি ঘর পেয়েছি—অবশ্য সম্পূর্ণ একলা নয়—এ ঘরে আমার সঙ্গে রাত্রে শান্তি এবং আমার এগার বছরের ছোট বোন সাবিত্রী অর্থাৎ 'সাবি' শুতো। কিন্তু ঘরটা আমারই—আমি ঐ ঘর সুন্দর করে সাজিয়েছি—সব নিচু নিচু আসবাব করেছি—খাটের পা কেটে সেটা নিচু করা হয়েছে। আসবাব অবশ্য সামান্যই। সাদা কালো দাবার ছকের মতো পাথরের মেঝে, পালিশ করা। ধূপ আর ফুলে সর্বদা সুগন্ধি রাখতাম সে ঘর। যে কেউ আসত, বলত—ঘর তো নয়, মন্দির। মাঝ-খানের দেওয়ালে রবিঠাকুরের একটা ছবি ছিল—মাথায় টুপি পরা—সেই ছবিটা আমার ভারি আশ্চর্য লাগত, ঘরের যে কোণেই তুমি থাক, মনে হবে তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এড়াবার পথ নেই।

অবশ্য যখনই দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন তাঁদের পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে উপস্থিত হতো তখনই আমার ঘর ছেড়ে দিতে হতো, কারণ বাড়ির মধ্যে বাড়তি ঘর ঐ একটাই। তারা দেওয়ালে হাতের ছাপ লাগিয়ে, পর্দায় হাত মুছে, টেবিলে জলের দাগ করে, গ্রহণের স্নানপুণ্যে তৃপ্ত হয়ে যখন চলে যেত তখন আবার আমাকে নূতন করে কাজে লাগতে হতো। মার এ সবে কিছু এসে যায় না। বাহ্যবস্তুর দিকে তিনি তাকান না, মানুষই তাঁর কাছে মূল্যবান। মানুষের মনে কষ্ট দিয়ে ঘর সাজাতে হবে এটা তাঁর একেবারেই মনে আসে না।

কিন্তু আমার আসে যায়—আমি সাজানো গোছানো বাড়িতে বসে কবিতা পড়তে এবং লিখতে ভালোবাসি। আর ভালো লাগে কাকার কাছে স্বাধীনতা-যুদ্ধের গল্প শুনতে। যে যুদ্ধটা আমাদের চারপাশে চলেছে অথচ আমাদের গায়ে আঁচ লাগছে না। কাকা আমার বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, ওদের বাড়িতেই একটু আধটু এদিকে ঝোঁক আছে। কাকার বড়দাদা জেলে আছেন সেটা আমার খুব গর্বের বিষয়। আমি সহপাঠীদের তাঁর গল্প করি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এসব

নেই, অর্থাৎ বাবা এসবের আমল দেন না। আজকে যখন পিছন দিকে তাকিয়ে ভাবি তখন বেশ মনে পড়ে বেশির ভাগ উচ্চশিক্ষিত উচ্চবিত্ত লোকেরা সে সময়ে স্বাধীনতার সম্ভাবনার কথা ভাবতেই পারতেন না। একটা কথা প্রায়ই শুনতাম—"এই করে এরা ইংরেজ তাড়াবে। তাহলেই হয়েছে!" কি করে তাড়াবে সে সম্বন্ধে অবশ্য তাঁদের কোনো পরিকল্পনা শুনি নি। যাহোক অল্প-বয়সীদের মনে এই সব দুঃসাহসিক ঘটনার বৃত্তান্ত মোহ সৃষ্টি করছিল—ডাণ্ডি মার্চ ও দপ্তরে ঢুকে সাহেব নিধনের নানা ঘটনাবলীর উত্তাপ পারিবারিক প্রতি-বন্ধকতা ছাড়িয়ে আমাদের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। একটা কাজ আমরা করতে শুরু করেছিলাম, সম্পূর্ণভাবে বিলাতি দ্রব্য বর্জন।

তাই আমার মুখে ও-কথাটা নেহাৎ বেমানান ছিল না—"বাড়িতে আবার একজন ইংরেজ কেন?" যদিও কিন্তু আমার আপত্তির আসল কারণ ছিল পাছে এর জন্যও আমার ঘরটি ছাড়তে হয়।

বাবা আমায় নিশ্চিন্ত করলেন, "একতলার সামনের ঘরে ও থাকতে পারবে, ঘরটাকে পার্টিশন করে দিলে সামনের দিকে লোকজন এসে বসতে পারে বা তোর কাকা থাকতে পারে আর ভিতরের দিকে ইউক্লিড থাকবে।"

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা 'ন্যাশনালিজম' প্রবন্ধটা দিলেন বাবা, বললেন—"এ বইটা পড়। ইংরেজ হলেই কি সে শত্রু? এমন দিন একদিন আসবে যেদিন প্যাট্রিয়টিজম একটা অপরাধ বলে গণ্য হবে।" সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমি বইটা নাড়াচাড়া করলাম, ভালো করে কিছুই বুঝলাম না। বাবা সব সময় আমাকে এ রকম নাগালের বাইরের বই দিতেন। আমিও না বুঝেই পড়তে ভালোবাসতাম, এই বোঝা না-বোঝার আলোছায়াময় জগৎটা আমার সব সময় ভালো লাগতো। যেন বুঝতে পারছি অথচ পারছি না, অপার রহস্যময় ঘোমটা পরা এই বিশ্বের অধরা ছায়াই তখন আমার কবিতার প্রেরণা ছিল।

দু-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেল, পার্টিশন করেও ঘরটা খুব ছোট নয়, একটা ছোট খাট, টেবিল, চেয়ার, একটা বড় বেতের সোফা, একটা পিয়ানো ও টুল আর মাঝখানে একটা গোল টেবিলের পাশে দাঁড় করানো ল্যাম্প—গৃহসজ্জা মন্দ কি? পর্দাও টানিয়েছি একটা গলির দিকের দরজায়। এই ঘরটা আমার ঘরের ঠিক নিচে।

সকালবেলা খাবার টেবিলে মির্চা ইউক্লিডের সঙ্গে বাবা নানা বিষয়ে গল্প করতেন, ও কি পড়বে বলতেন। একদিন বাবা বললেন, "তোমরা দুজনে আমার

কাছে 'শকুন্তলা' পড়, 'হিতোপদেশ' থেকে সংস্কৃত শিখে লাভ নেই। একটা উপভোগ্য বই হলে ভালো লাগবে।" পরের দিন থেকে আমাদের একসঙ্গে পড়া শুরু হল। মাদুর পেতে মাটিতে বসে সাহেবের সঙ্গে সংস্কৃত পড়া দেখতে সেকালের মানুষদের কেমন লাগত কে জানে! আমি দেখেছি বাবার বাঙালী ছাত্রদের চোখে ঈর্ষামিশ্রিত বিস্ময়, আমি দেখেছি বর্ষীয়সী মাতৃস্থানীয়াদের মুখে চোখে সন্দেহ ও আপত্তি আর সমবয়সীদের চোখে কৌতুক। বাবার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মা ও বাবা দুজনেই খুব সহজভাবে ওর উপস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন। সে ক্রমে ক্রমে বাড়ির একজন হয়ে যাচ্ছিল।

বাবার কাছে পড়বার সময় আমি ইচ্ছে করেই মাদুরে বসতাম। বাবা বসতেন আমাদের দুজনের মাঝখানে—একটা সোফায়। আমি বুঝতাম মাদুরে বসতে মির্চার খুব ভালো লাগছে, একে নূতনত্ব তারপর আমাদের সঙ্গে একাত্ম হবার ইচ্ছা। ও প্রত্যেকটা জিনিস দেখে, খুঁটিয়ে দেখে। আমাদের সব কিছু জানতে চায় আর প্রত্যেকটা ব্যাপারে একটা অর্থ খুঁজে বের করে।

মা বলতেন, "ইউক্লিড খুব ভালো ছেলে, ভদ্র শান্ত বিনীত। তুমি আমায় মা বলো না কেন মির্চা, মিসেস সেন বলো কেন? মা বলবে।"

তারপর থেকে সে মা বলতো। কিন্তু সে আমায় বলেছিল ওদের দেশে এত অল্পবয়সী মেয়েদের কেউ মা বলে না, তারা রাগ করে। আমার মার বয়স তখন কতই বা, বত্রিশ কি তেত্রিশ হবে! কিন্তু লালপেড়ে শাড়ি, কপালে সিঁদুর আর পায়ে আলতা-পরা পরমাসুন্দরী আমাদের মা কেবলই মাতৃমূর্তি, তাঁর বয়সের কথা কে ভাবে! কি জানি, ওদের দেশটা তো ভারি অদ্ভুত, মেয়েদের মা বললে রাগ করে! সেজন্য বয়সের হিসাবের দরকার কি!

সকালবেলা খাবার টেবিল থেকে সকলে উঠে চলে যেত। আমরা বসে বসে গল্প করতাম। তারপর আর একটু উঠে লাইব্রেরীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে ঘণ্টা দুই কেটে যেত প্রায়ই, কেউ লক্ষ্যই করত না। তিনটে ঘর জুড়ে বাবার সাত-আট হাজার বইয়ের লাইব্রেরী—ঐখানেই আমাদের গল্প চলত। সিঁড়ি দিয়ে বাবা নেমে গেলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, এ রকম কত দিন হয়েছে। এমন কি, আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করছ কেন—তাও নয়। যদি মীলুর সঙ্গে কিংবা গোপালের সঙ্গে গল্প করতাম তাহলে ঠিকই বকুনি খেতাম। কিন্তু মির্চা ইউক্লিডের সঙ্গে নিশ্চয় শাস্ত্র আলোচনা করছি, পরস্পরের উন্নতি হচ্ছে!

বই হাতে করে আমি উপর থেকে নেমে আসছি মির্চা আমায় পথের মাঝখানে ধরল—"তুমি নাকি কাল একটা দার্শনিক কবিতা লিখেছ?"

"হ্যাঁ"—আমার গতকালের কবিতাটি নিয়ে বাবা খুব উচ্ছ্বসিত। ওর মধ্যে একটা লাইন আছে—"কালের যবে হারিয়ে যাবে মুহূর্ত নিমেষ", এ-লাইনটা বাবার খুব ভালো লেগেছে, এর মধ্যে একটা বিরাট তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে—প্রশ্নটাই হচ্ছে তত্ত্ব। আমার বয়স যখন চৌদ্দ অর্থাৎ দু-বছর আগে, পুরীর সমুদ্রের তীরে বসে আছি সন্ধ্যেবেলা, আমার হঠাৎ মনে হল এটা সকাল—একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল, সেটা আমি কবিতায় লিখেছিলাম—'লহ মোরে, লহ মোরে, মোরে চল লয়ে, আমার এ স্বপ্নস্রোত যেথা গেল বয়ে।' সে দেশটা কি রকম?—'আশাহীন ভাষাহীন শেষ যেথা সব, পান্থহীন পথ পরে নাহি কলরব। জন্মহীন মৃত্যুহীন নাহি রবে কাল, নাহি রাত্রি নাহি দিন না হয় সকাল!' বাবা বলেন 'কাল' সম্বন্ধে রু'র অনুসন্ধানী চিন্তা রীতিমত শাস্ত্রমুখী। 'কাল কি?' বাবার এই উচ্ছ্বাসে আমি খুব গর্বিত! কিন্তু যখন বাবা আমাকে নির্দেশ দেন, তুমি এই রকম লিখে আন, তখন আমার ভালো লাগে না। কবিতার স্বাভাবিক গতি বন্ধ হয়ে যায়—একটা ডানা মেলা পাখি ডানা ভাঁজ করে পায়ের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে। 'ভোগপাত্র' কবিতাটি লিখে তাই আমি খুশী নই।

মির্চা মুচকি হেসে বললে, "তুমি কি দার্শনিক কবিতা লিখবে এতটুকু মেয়ে!"

"আমি মোটেই এতটুকু নই··· তাছাড়া আমি তো দার্শনিক।"

"তুমি দার্শনিক?"

"নিশ্চয়ই। যে দেখে বা দেখতে চায় সেই দার্শনিক! আমি তো দেখি, দেখতে চাই।"

"আচ্ছা চল, তোমার কবিতা শোনাবে।"

আমি ওর ঘরে ঢুকলাম। আমি কয়েকদিন হল ওর ঘরে ঢুকছি, কেউ আমাকে বলেনি যে ওর ঘরে ঢোকা ঠিক নয়, তবু পায়ে একটু বাধা আসে। এটা কি? আমি বুঝতে পারি না এই ঈষৎ বাধা আর সংকোচটা কি। আমি স্বচ্ছন্দ নই তবু খুব স্বচ্ছন্দ ভাব দেখিয়ে বসলাম বড় বেতের চৌকিটাতে। মাঝখানে টেবিল তার ওপাশে হেলান দিয়ে ও ওর বিছানায় বসেছে।

"বোঝাও তোমার দার্শনিক কবিতা।"

"না না, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলি শোনো—নতুন তাঁর যে বইটা বেরিয়েছে ওটা তো উনি আমাকে উৎসর্গ করেছেন, সেই কবিতাটি শোন!"

"সে কি? তোমাকে উৎসর্গ করেছেন!"

"অত চমকে উঠলে কেন ? পারেন না কি ?"

আমি মনে মনে হাসছি, ও বিশ্বাস করেছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে, ওকে ঠকাব। পরে কাকার কাছে জানতে পারে জানুক—

"তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি,
জানি না তোমার নাম, তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি।"

থেমে থেমে অনুবাদ করলাম, অনুবাদ যে কি পদার্থ হল, বোঝা শক্ত নয়। ও ভ্রূকুটি করে রইল! কথাটার ভিতরের অর্থ বোঝবার চেষ্টা করছে। আমি উঠে পড়লাম।

ও বললে, "জানি না তোমার নাম—লিখলেন কেন ?" ও বুঝতে পেরেছে আমি ধোঁকা দিয়েছি।

"ঐটাই তো গোপনীয়।"

এই রকম কথাবার্তা মির্চা ইউক্লিডকে বিভ্রান্ত করে, একে ভাষার বাধা তো আছেই দুপক্ষেই—তাছাড়া ভাবের বাধাও। আমরা ঠিক কি ভাবি, ও বোঝে না। সেই না-বোঝার অন্ধকারে ও হাতড়ে বেড়ায়, ওর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ওর গলার স্বর কাঁপে—'ধরা দেবে না অধরা ছায়া···রচি গেল প্রাণে মোহিনী মায়া' —এর মধ্যেও মোহিনী মায়া নেমে আসছে কি ? কি জানি!

"ঐ মালতী লতা দোলে—পিয়াল তরুর কোলে—" বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে যেতে গেলে মির্চার ঘরের সামনের একটা সরু গলি দিয়ে যেতে হয়—ঐ গলির পূব দিকে উঠোন। ঐ উঠোনের থেকে সিঁড়ি দিয়ে গলিতে উঠতে হয় আর খাবার ঘরেও। মির্চার ঘরের ঠিক উপরে আমার শোবার ঘর। বাইরের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণের দিকে নিচেও একটা বারান্দা আছে, উপরেও একটা। নিচের বারান্দার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা মালতী নয়, মাধবীলতা নিচ থেকে উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। সেটা বারমাস ফুলে ভরে থাকে, সাদা লাল রঙের মঞ্জরী, আমি ঐ লতাকে দোলাই। ওর ঘরের সামনের গলিটা পেরিয়ে বারান্দার পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ঐ লতাটার আশ্রয়ে এসে দাঁড়ালে আমি জানি একটু পরে মির্চা উঠে আসবে, পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাকে আসতে ও দেখেছে। আমি যে ওর জন্য অপেক্ষা করে আছি, সেটা আমি স্পষ্ট করে জানি না, কারণ জানতে চাই

না—তবু আমি উৎকর্ণ—ও কেন আসছে না, দেখতে পায় নি কি? কি করা তাহলে, এখানে একটা গান গুনগুন করব, না, কবিতা? কী অন্যায়! কী অন্যায়! এমন তো হওয়া ভালো নয়—যা ভালো নয় তা কখনো করব না, আমি দার্শনিক হব। দার্শনিক যে সত্যাশ্রয়ী, সত্যসন্ধানী। সে কখনো লুকোচুরি করে না, তাই নয় কি? আমি লতাটা ধরে আছি—আমার ভিতরটা মৃদু মৃদু কাঁপছে আশায় ও আশঙ্কায়। এমন সময় রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে, চটির বিশ্রী শব্দ করে 'ম'-বাবু উঠে এলেন। 'ম'-বাবু আমার এক নিকট আত্মীয়ার দেবর। আমি জানি ওর মনের ইচ্ছাটা কি—ওর সঙ্গে আমি কথা বলি, কারণ ও তো আমাদের একরকম আত্মীয়ই।

"এই যে নমস্কার—"

"নমস্কার।"

"আমি সামনের মাসে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছি।"

"ভালোই তো।"

"কি জানি কতদিন লাগবে ব্যারিস্টারী পাশ করতে।"

"মন দিয়ে পড়লে বেশিদিন তো লাগবার কথা নয়!"

"মন কি আর দিতে পারব?"

এই সেরেছে! এইবার শুরু হবে স্তবগান। এই সব প্যানপ্যানে খোসামুদে ছেলেগুলোকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। এ-রকম বেশ কয়েকটি আছে। মীনু আর আমি খুব হাসি এদের নিয়ে। কিন্তু আজ আমার ভয় করছে। মির্চা যদি বেরিয়ে এসে একে দেখে তাহলে ভ্রূকুটি করবে। মুখ অন্ধকার হবে। ও কি ভেবে নেবে কে জানে!

যা ভয় করেছি তাই। পর্দা সরিয়ে মির্চা বেরিয়ে এল, এক পা এগিয়ে ওকে দেখেই আবার ঘরে ঢুকে গেল। রীতিমত অভদ্রতা। 'ম'-বাবু কি ভাবল! মহা-বিপদ এদের নিয়ে, এরা সবাই সমান। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম, "যান না উপরে, মা উপরে আছেন, এখানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যাথা করবার দরকার কি?"

"আপনার পা ব্যাথা হয় না? না, কারু জন্য অপেক্ষা করছেন? আমি প্রতিবন্ধক?"

'ম'-বাবু ভিতরে চলে গেল, আহত, বাণবিদ্ধ।

আমার কান্না পাচ্ছে, খুবই কান্না পাচ্ছে, এদের কথা আমার ভাববার দরকার কি! এরা কে কি ভাবল তাতে কি এসে যায়! আমার কি ভাববার

কিছু নেই ? কতদিন হয়ে গেল আমি শান্তিনিকেতনে যাইনি !

ওখানে না গেলে আমার মন শান্ত হবে না। শান্তিনিকেতনে ছাতিমতলায় যে পাথরের ফলকে লেখা আছে—

"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" মহর্ষিদেব ঈশ্বরকে চিনতেন, তিনিই তাঁর প্রাণের আরাম ছিলেন—হবেও বা। আমি তো ঈশ্বরকে চিনি না। বাবা সেদিন থিয়লজিয়ানদের যুক্তি বোঝাচ্ছিলেন—কানের ভিতর যে যন্ত্রটা নিপুণভাবে তৈরী, যে হ্যামার আর এনভিল বসানো আছে, সে কি অমনি হয়েছে ? কেউ তো করেছে, সে কে ? এটাই একটা ঈশ্বরের অস্তিত্বের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ। অমন করেও হয়তো ঈশ্বরের প্রমাণ হয়, কিন্তু সে ঈশ্বর কি প্রাণের আরাম হতে পারে ?' যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, যাকে দেখলে বাতাস মধুর হয়—দূর ছাই, শ্রাদ্ধের মন্ত্র মনে আসে কেন কে জানে—আসলে এটা তো প্রেমের মন্ত্র। সেদিন স্টোর রোডের বড় লাল বাড়িটাতে আমরা গিয়েছিলাম, কলকাতার সব 'এলিট'রা এসেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেনের গান শুনতে, অতুলপ্রসাদ সেন হারমনিয়াম বাজিয়ে গাইছিলেন—"তুমি মধু, তুমি মধু, তুমি মধুর নিঝর, মধুর সায়র আমার পরাণ বঁধু—" উনি নিশ্চয় ঈশ্বরের কথা বলছিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে বঁধু তো ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, রাধাও ঈশ্বর। সভায় সবাই চোখ বুজে বসে আছে, কারু কারু চোখ দিয়ে জল পড়ছে—কেন ? ওরা কি ঈশ্বরকে বুঝতে পারছে ? বাজে কথা, আমি তো জানি 'এলিট' হলে কি হবে, একেক জন কি মিথ্যাবাদী আর স্বার্থপর ! আমার যতদূর ধারণা মিথ্যেবাদীদের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগাযোগ নেই। আর মীলু ? ওর কি দৌড় আমার জানা আছে। ঈশ্বর আমারও ধারে কাছে নেই, ওরও না। আমি চোখ বুজলাম—গানটা কিন্তু খুব সুন্দর গাইছেন। ভদ্রলোকের গলায় কি দরদ ! 'দরদ' কথাটা ভালো, ঠিক মানেটা বোঝায়—আমার কিন্তু ওঁর মুখের দিকে দেখবার ইচ্ছে নেই—আমিও চোখ বুজে আছি—কি চমৎকার গলা, সত্যিই "বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী—" ঐ সুরের আলোয় আমার ভিতরটা উজ্জ্বল, আমি দেখতে পাচ্ছি অন্য একটা দেশ, নিচু একটা বারান্দার ছাতের এক পাশে উঠে গেছে নীলমণি লতা, তাতে গুচ্ছ গুচ্ছ নীল ফুল, ওর ইংরেজী নাম উইস্টেরিয়া—আর বারান্দার টেবিলের উপর ঝুঁকে একজন লিখছেন তার সাদা কোঁকড়া চুলের উপর ভোরের আলো পড়েছে--তিনি লিখছেন আর গুনগুন করে গান গাইছেন, সে গানটা অন্য, কিন্তু দুটো গান আমার মনের মধ্যে মিশে যাচ্ছে—"তখন অনলে অনিলে জলে, মধু প্রবাহিনী চলে, বলে মধুরং মধুরং।"

দেখ তো, কেন এদিনটা ভুলেছিলাম। আমার পক্ষে একজন মানুষ ছাড়া এমন শান্তির উৎস, প্রাণের আরাম আর কেউ নেই—থাকতে পারেনা, হওয়া উচিত নয়। আমার ভিতরটা কাঁপছে, মনে হচ্ছে নিজের কাছে যেন সত্যভঙ্গ করছি! কি সে সত্য? আমি জানি না, জানি না।

মির্চার কাণ্ড দেখেছ! অভদ্র, অভদ্র। ওর ঘরের সামনে দিয়ে 'ম'বাবু চলে গেল তবুও বেরিয়ে এল না—আমিও ওর ঘরে যাব না। আজ এ-প্রতিজ্ঞাটা রাখব, রাখবই রাখব। তাতে ওর সঙ্গে যদি একেবারে বরাবরের মতো কথা বন্ধ হয়ে যায় তাও ভালো। আমি অন্যমনস্ক হয়ে মাধবীলতা থেকে একটা বড় গুচ্ছ ছিঁড়ে নিয়ে উপরে যাব বলে এগিয়ে গেলাম। ওর ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখি তিনি নিবিষ্ট মনে বই পড়ছেন—কে সামনে দিয়ে এল বা গেল দেখতেই পাচ্ছেন না! আমি পর্দাটা ফাঁক করে ফুলটা ছুঁড়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছি—পিছন থেকে ওর ডাক শুনতে পেলাম—"অমৃতা! অমৃতা!"

"মা···মা···মা···" ডাকটা যেন মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে এল। মহাসিন্ধু নয়, মহাজগৎ থেকে, সামনে তাকিয়ে দেখি আমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার হাতটা টেলিফোনের উপর—টেলিফোন বাজছে—"মা তুমি টেলিফোনটা তুলছ না কেন?" বহু কষ্টে টেলিফোনটা তুললাম—আমার হাত অসাড়, আমি অস্থির, একই সঙ্গে একই মুহূর্তে এত দূরত্ব পার হওয়া যায়? আমি তো এখানে ছিলাম না, কখনই নয়।

এটা স্মৃতি নয়। আমার শরীর এইখানে চেয়ারে নিশ্চয় পড়েছিল কিন্তু আমি মহাকালে অনুপ্রবিষ্ট, যার সামনেও নেই পিছনেও নেই। যেখানে 'নাহি রাত্রি, নাহি দিন, না হয় সকাল'। এই শরীর ও মনের বিচ্ছেদ, এই একই সঙ্গে দুই সময়ে, অর্থাৎ আমরা যা দুই সময় বলে দেখতে অভ্যস্ত, সে-রকম দুই সময়ে উপস্থিতি নিশ্চয় শরীরকে আঘাত করে। তাই আমি অবসন্ন। আমার ছেলের বয়স ত্রিশ বছর, সে একজন বয়স্ক মানুষ, ছেলেমানুষ নয়, সে কি ভাবছে কি জানি—কিন্তু ও ওর বাবার মতো, না বললে কিছুই জিজ্ঞাসা করবে না।- আস্তে আস্তে ও ঘর থেকে চলে গেল। আমি ওর অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছি! কে গেল, কোথায় গেল, এর পরে কি, বুঝতে পারছি না। লেখা এসে টেলিফোনটা তুলে নিল আমার হাত থেকে—ওপারে কেউ ছিল—তাকে বলল, 'মা তো শুয়ে পড়েছেন,' তার নম্বরটা নিল। এখন আমি সব বুঝতে পারছি—ঐ লোকটার সঙ্গে কথা বলার দরকার, কিন্তু ভালোই হয়েছে। কি কথা বলব, যদি ভুল হয়। লেখা বললে, "মা আপনি শুয়ে পড়বেন চলুন।

"আমি আপনাকে বলছি, আপনি কারুর সঙ্গে কথা বলুন।"

"আমার কিছু হয়নি লেখা, কিছু না।"

"দেখি তুলে তার বুকের আচ্ছাদন,
সেখানে এখনও বাস করে কিনা মন,
হনুমান এ শরীরের মাঝে যার
অজর অমর সত্তার সম্ভার
পদে পদে গায় অসম্ভবের গান,
তাই শুনতেই আজো পেতে আছি কান"

অসম্ভব, অসম্ভব। জীবন কী অসম্ভবের সম্ভাবনায় পূর্ণ—এত কাল পরে কি এমন করে সব মনে আসতে পারে—এত বেদনা নিয়ে, এত রক্তক্ষরণ হয়?···

"মা, কি বলছেন চোখ বুজে—মন্ত্র জপ করছেন নাকি?"

"কবিতা, কবিতা, অনেক দিন পরে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে—

শস্ত্র ছেঁড়ে না, অগ্নি দহে না যারে
দেখব তারেই অশ্রুর পারাবারে
পাগলের মতো দু-হাত বাড়ায়ে ধরে—
অধরা প্রাণের আবার স্বয়ংবরে
চলো যাই দূরে যেখানে দাঁড়ায়ে কাল
ভেঙ্গে চুরে দিয়ে ঝেড়ে ফেলে জঞ্জাল
শুধু হাতে নিয়ে মুক্ত প্রাণের দীপ
নূতন বধূর কপালে পরাবে টিপ···
সেখানে যাবই যেখানে রয়েছে থেমে
বাসররাত্রি, অবিচল কারু প্রেমে···"

এতক্ষণে বুঝতে পারছি কেন আজ এক বছর ধরে আমার মনে মনে ক্রমে ক্রমে কোথাও যাবার ইচ্ছাটা এত প্রবল, এত দুর্দমনীয় হয়ে উঠছে। কেবল মনে হয় কোথাও যাই, কোথাও যাই, দূরে—অনেক দূরে—আর এখন মনে হচ্ছে এই বারান্দাটা দিয়ে বেরিয়ে আকাশে ভেসে কোথাও চলে যাই—

লেখা বলছে, "শুতে চলুন।"

আমি বলছি, "চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই।"

আমি হাসছি। লেখাও হাসছে—"চলুন, শুয়ে পড়বেন চলুন।"

রাত্রি অনেক হয়েছে, আমার স্বামী ঘুমোন নি। সেপ্টেম্বর মাসে সেরগেই এসেছিল, আজ অক্টোবর শুরু। এই এক মাস পর উনি লক্ষ্য করেছেন আমি এখানে নেই। কি হয়েছে উনি জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না। সেটা ওঁর স্বভাব নয়—এই দীর্ঘ আটত্রিশ বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে, এর মধ্যে আমাদের যুক্ত জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। উনি নিশ্চয় কোনো এক রকম করে জানেন যে এই সংসারে আমি একান্ত সংসারী গৃহিণী হয়েও আমার কিছুটা বাকি আছে—যার খবর উনি জানেন না। তাতে ওঁর কিছু আসে যায় না, কারণ উনি দিতেই জানেন, দাবী করতে জানেন না। আমি জানি ওঁকে সংশয়ে রাখা উচিত নয়। আমার কিছু বলা উচিত, কিন্তু এতদিন পরে আমি কি বলব? ওর বইটার কথা কি করে বলব? মির্চা, তুমি এত মিথ্যা কথা লিখলে কেন? যা সত্য ছিল তাই কি যথেষ্ট নয়? মিথ্যা কথা লেখা হয়েছে গল্প বাজারে কাটবে বলে। আজকাল তো দেখি অসভ্যতা না করলে বইয়ের কদর হয় না—তোমাদের দেশ থেকেই তো রুচিবিকার আমদানি হয়েছে—কদর্য, দেহবদ্ধ প্রেমের নির্লজ্জতা। হায় হায়! তুমি শেষটায় আমায় তার মধ্যে নামিয়েছ। সত্যের দায় আমি নিতে পারি, মিথ্যার দায় বইব কি করে? আমার ভবিষ্যৎ আছে, নামখ্যাতি আছে, ছেলেমেয়ে আছে, আমি ভারতীয় নারী, সুনাম নষ্ট হওয়া তো মৃত্যুর অধিক। অপমানে আমার সারা শরীর গরম হয়ে যায়—আমি মুখে চোখে জল দিয়ে আসি। আজ এক মাস হয়ে গেল, একটি রাতও আমি ঘুমোতে পারছি না। ক্রোধের দাহ জ্বলছে। সে জ্বালায় জ্বলছে অনেক কিছু। আজ চল্লিশ বছর ধরে আমার যে মান সম্মান সম্ভ্রম, সমস্ত নষ্ট হতে চলেছে—তোমার বইয়ের কুড়িটা এডিশন হয়েছে, বহুজনের সামনে তুমি আমায় বিবস্ত্রা করেছ—একে ভালোবাসা বলে নাকি? বইটা আমি পড়িনি তবে যা শুনলাম তাতে তাই তো মনে হচ্ছে—বইটা যোগাড় করে পড়তে হবে। কিন্তু পড়ে দেবে কে? ঐ ভাষা তো আমরা কেউ জানি না। আমি যন্ত্রণায় ছটফট করছি। ওর মুখটা মনে করবার চেষ্টা করছি, মুখই যদি মনে না পড়ে তবে ঝগড়া করব কার সঙ্গে? আমার ওর মুখ ভালো করে মনে পড়ছে না—সে যে অনেক দিন হয়ে গেল—কেবল দেখি পার্টিশনে হেলান দিয়ে ও বসে আছে, ওর সেই বকের পালকের মতো সাদা পা দুটো।…আমি জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। আজকাল জানালায় শিক থাকে না, থাকে গ্রীল—ওটা ধরে দাঁড়ান যায় না। উন্মুখ মন যখন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় তখন গরাদ ধরে শক্তি পাওয়া যায়। নন্দলালের একটা ছবি আছে, রাত্রির অন্ধকারে আবছা মূর্তি বন্দিনী সীতা একটা গরাদ ধরে আছে

—আমার নিজেকে তেমনি মনে হচ্ছে—এই গরাদ খুলে দাও—যাই, যাই, সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে, আমার এই চল্লিশ বছরের সংসার ছেড়ে, আমার নাম খ্যাতি কর্তব্য ছেড়ে চলো যাই, চলো যাই, চলো যাই—মির্চা তোমায় একবার দেখতে চাই।

আমি বাবাকে বললাম, "রবীন্দ্রনাথ বিদেশে যাবার আগে আমরা কি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব না?"

"নিশ্চয়ই, ইউক্লিডও যেতে চায়।" তাঁকে লেখা হল—যথারীতি একদিন পরই উত্তর এল—"তথাস্তু। সকন্যক, সশিষ্য, এসো।"

সে বারে আমরা বড় গেস্ট হাউসে উঠেছিলাম। সকালবেলা উত্তরায়ণে দেখা করতে যাব আমরা তিনজন, আমি মির্চা আর বাবা। আমি আর মির্চা একটু আগে বেরিয়ে পড়েছি, বাগানে টেনিস কোর্টের কাছে পায়চারী করছি, বাবা আর আসছেনই না, সম্ভবত পথে ক্ষিতিমোহন সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে—ভালোই হয়েছে, তাতে আমরা ক্ষুণ্ণ নই। কি সুন্দর সকালটা—কলকাতার পর, শান্তিনিকেতন আমাদের দুজনকে যেন আলিঙ্গন করছে, 'তার আকাশ ভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে—।'

বাবা এলেন, "চল"। আমি বললাম, "আমি পরে যাব, তোমরা যাও। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসি—" আমি ওঁদের সঙ্গে যাব না। আমার একলা কথা বলার আছে। আমি অবশ্য কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি না। এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই—আমি দু-তিন দিনের জন্য আসি, তখন আবার কোন্ বন্ধুর সন্ধানে যাব? একটি যে আছেন একাই একশ! মাত্র একশ?

কবির কাছ থেকে এসে বাবা মির্চাকে নিয়ে লাইব্রেরী দেখাতে গেলেন। ও পুঁথির সংগ্রহ দেখবে। জ্ঞানের জন্য ওর আকণ্ঠ তৃষ্ণা। বাবা এই ছাত্র নিয়ে খুব গর্বিত। বাবার প্রদর্শনীতে আমরা দুজনেই দ্রষ্টব্য বস্তু!

কবি বড় জানালার কাছে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন, আমি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে পায়ের কাছে একগুচ্ছ ফুল রাখলাম। উনি হাত বাড়িয়ে দিলেন—"হাতে দাও।"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন! মৃদু মৃদু হাসছেন অর্থপূর্ণ হাসি—"কি গো, সাহেবের সঙ্গে কি গল্প হচ্ছিল? কত কথা বলছিলে? কথার

ফুলঝুরি। আমি সাহেবকে বলেছি, মেয়েদের কথা খানিকটা বাদ দিয়ে বিশ্বাস করবে। যত পদচারণা তত বাক্যচারণা।"

"আপনি কি করে দেখতে পেলেন?"

"কেন দেখতে দিতে চাও নি নাকি? তাহলে আর একটু সাবধান হতে হতো।"

আমি লক্ষ্য করলাম জানালা দিয়ে নিচের বাগানের হাতাটা দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ।

"আঃ আমার রাগ হচ্ছে।"

"তাতো হচ্ছেই, কি রকম রাগ?"

উনি আমার কাপড়ের আঁচলটা ধরে বললেন, "একি নীলাম্বরী?" তার পর গান করে, "পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ"—আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুক ধ্বক ধ্বক করছে, পরিহাসটা ভালো লাগছে কিন্তু সহ্য করতে পারছি না, মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়েছে, উনি আমার বিনুনীটা ধরে টান দিয়ে মুখটা ঊর্ধ্বমুখী করে দিলেন। আমি চোখ বুজে আছি। ওঁর চোখের দিকে তাকাবার আমার সাহস নেই—আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এইবার উনি আমার বিনুনীটা ছেড়ে দিলেন—"ছ্যাখো কাণ্ড! কাঁদে কেন?"

আমি যা যা বলব ভেবেছিলাম সব ভুলে গেলাম। কিছু আমার মনে পড়ছে না, আমি ওঁর হাঁটুর উপর মুখ রাখলাম। উনি আমার মাথায় তাঁর অভয় হস্ত রেখে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন, "অমৃতা তোমার বয়স অল্প। মনটাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করো না, সেটা স্বাস্থ্যকর নয়। মনটা স্বচ্ছ কাকচক্ষু সরোবরের মতো স্থির রাখ, তার নিচে বহুদূর গভীরতা, কিন্তু এখনই তাকে চঞ্চল করে উত্তাল করার দরকার নেই—শান্ত হয়ে থাক। সে মনে বাইরের নানা ছায়া পড়বে সহজভাবে তা গ্রহণ কর, সেই যে আমি লিখেছি—'সত্যেরে লও সহজে'—তোমার নিজের ভিতরে যে মাধুরীলতা আছে দূরে নেমে যাবে তার মূল, তার উপরে ফুল ফুটবে। অপেক্ষা কর। এখন উঠে বসো একটু গল্প করা যাক।… তোমার ছাতিমগাছটা কেমন আছে?"

"আমরা তো এখন আর সে বাড়িতে নেই।"

আমাদের আগের বাড়িতে একটা ছোট্ট ছাতিমগাছ ছিল। আমি সেই গাছটার উপর একটা কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটা রবীন্দ্রনাথের ভালো লেগেছিল। মির্চা সেই কবিতা শুনে অবাক, বলে 'প্যানথীঈজম'। প্যানথীঈজম, বস্তুটি কি তখন জানতাম না। 'গাছের সাথে একটি মেয়ের প্রেমের কথাটিকে'

এই লাইনটা ওকে ভাবিয়েছিল, এর অর্থ কি! এটা যে কোনো ইজম নয়, কেবল মাত্র কবিত্ব, তা ও বুঝতে পারে না।

সেদিন গেস্ট হাউসে ফিরে বাবার কাছে প্রচণ্ড বকুনী খেলাম, দেরী করেছি বলে—দেরী হওয়াতে কিন্তু কিছুই ক্ষতি হয় নি—ট্রেনও ফেল করব না, বা কারু কোনো বিপদও হচ্ছে না। তবু হঠাৎ চটে গেলেন। বাবা যখন রেগে যান তখন কোনো জ্ঞান থাকে না। আমাকে এত বকতে লাগলেন যে আমি অপদস্থ বিপর্যস্ত হয়ে গেলাম, মির্চাও করুণভাবে আমার অবস্থা দেখতে লাগল। সকাল-বেলার সুন্দর সুরটা কেটে গেল। সুর কাটতে, তাল ভাঙতে, বাবার জুড়ি নেই—ইন্দ্রসভা হলে ওঁর মর্ত্যে নির্বাসন হতো। কিন্তু এটা তো ইন্দ্রসভা নয়—ওঁরই নিজের সংসার। এখানে সকলকেই মাথা নিচু করে সয়ে যেতে হয়।

সেদিন ট্রেনে উঠে বাবা ক্রমাগত শান্তিনিকেতনের নিন্দা করতে লাগলেন, 'এ প্রতিষ্ঠান টিঁকবে না, টিঁকতে পারে না, কবি যেদিন চক্ষু বুঝবেন তার পর-দিনই উঠে যাবে'। মির্চা চুপ করে শুনছে, মাঝে মাঝে সায়ও দিচ্ছে। বাবা আরো বলে চলেছেন—এইবার প্রতিষ্ঠান ছেড়ে কাব্য নিয়ে পড়েছেন, 'প্রার্থনা' কবিতার ঐ লাইনটি 'দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়'—ঐ চরিতার্থতা' শব্দটা নাকি যথেষ্ট কাব্যগন্ধী নয়। ওটার প্রয়োগ একেবারে ভালো হয় নি। তা হতে পারে। আমি এখন কাব্যবিচার শুনতে চাই না। আমি রেলগাড়ির জানালায় মাথা রেখে ওঁদের দিকে পেছন ফিরে বসে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছি। রেলগাড়ির চাকা ধ্বক্‌-ধ্বক চলেছে। গাড়ির চাকা কথা বলে, গান করে। আমার মনে একটা গান গুন্‌ গুন করছে— 'কোন দূরের মানুষ যেন এল আজ কাছে···তিমির আড়ালে···এ···এ···নীরবে দাঁড়ায়ে আছে'—তখন রবীন্দ্রনাথের গান এত শোনা যেত না, ক'জন গাইত? হঠাৎ কখনো ওঁর গান শুনলে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠত—এ গানটা মাত্র গত সপ্তাহে শুনেছি, কালিদাসবাবুর কাছে। কালিদাসবাবু খুব মিষ্টি গান করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম, উনি সেকালের ঠাকুরবাড়ির গল্প করেন—আমি প্রায়ই বিকেলে ওখানে যাই। সেদিন তিনি ছিলেন না অপেক্ষা করে করে সন্ধ্যা হয়ে গেল, তাই কালিদাসবাবু আমায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। রমেশ মিত্র পার্কটা পার হতে হতে গুনগুন করে উনি গাইছিলেন— 'বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা'—আমার কানে সুরটা রয়েছে আমি গুনগুন করে গলায় তোলবার চেষ্টা করছি। তিমির

আড়ালে…রেলের চাকা বলছে…নীরবে দাঁড়ায়ে আছে। বাবা উঠে বাথরুমে ঢুকলেন—মির্চা এসে আমার পিছনে দাঁড়াল, "অমৃতা—"

"বলো—"

"এদিকে তাকাও"—আমি ঘুরে বসে ওর দিকে তাকালাম—ও স্থির অপলক আমার দিকে চেয়ে রইল সম্মোহিত দৃষ্টি। আমি দেখতে পাচ্ছি ওকে, এখনও ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি—ওপরের বাঙ্কের দড়িটা ধরে একটু ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটু পরে আমরা দুজনেই হেসে ফেললাম।

"কি ভাবছিলে এতক্ষণ ?"

"একটা গান মনে করবার চেষ্টা করছিলাম।"

বাবা বেরিয়ে এলেন—"কি বলছিস তোরা ?"

"বাবা ইউক্লিডকে ঐ গানটা অনুবাদ করে দাও না, আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।"

"তুমি কর, তুমিই বা পারবে না কেন—" তারপর এ আমার অসাধ্য বুঝে বাবা বলতে লাগলেন, "আচ্ছা, 'বুকে দোলে তার বিরহব্যথার মালা… গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা'… বর্ষার বর্ণনায় বিরহের কথা আসতেই হবে—বর্ষা বিরহীর মনকে সন্তপ্ত করে, পর্যুৎসুকী করে"—বাবা মেঘদূতের কথা বলতে লাগলেন—"এদিকে বলা হচ্ছে, 'বিরহ ব্যথার মালা' অন্যদিকে 'গোপন মিলনের' কথা! মিলন ও বিরহ এই দুই বিপরীত ভাব দিয়ে একটা সম্পূর্ণতা বোঝান হচ্ছে।" রবীন্দ্রকাব্যে বিপরীতের প্রয়োগ সম্বন্ধে বাবা খুব ভালো করে বলতে লাগলেন।

কিন্তু আজকের দিনে এই দ্বিতীয়বার তাল কাটল। এত কথার দরকার কি—আজ যে মুহূর্তে মির্চা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি বিরহ ও মিলন একসঙ্গে কি করে থাকে, আর তার ব্যাকুলতাই বা কি। আমি ওর ফর্সা গলার উপর সেই অদৃশ্য মালার সুগন্ধ পাচ্ছি…'গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা'…

মির্চা আমাদের বাড়ি আসবার কত পরে আমার ঠিক মনে নেই, ও প্রথম একটা কাণ্ড করল। খাবার টেবিলের এক মাথায় বাবা বসে আছেন, উল্টো মাথায় মা, মাঝখানে মুখোমুখি ও আর আমি। সে আস্তে আস্তে তার পা বাড়িয়ে দিয়ে আমার পায়ের উপর রাখল। আমি পা সরিয়ে নিলাম, আমি ভাবতে

চাইলাম দৈবাৎ লেগে গিয়েছে—যদিও আমার শরীর-মন চমকে উঠল, কিন্তু কি আশ্চর্য সেই মুহূর্তে ওর দিকে চেয়ে আমার হঠাৎ মনে হল—এ চলে গেলে আমি বাঁচব কি করে? খাবার টেবিল থেকে সবাই উঠে গেলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম —"তোমার পা কি হঠাৎ লেগে গিয়েছিল? তা তো নয়।"

"না, তা নয়।"

"কী স্পর্ধা! কী সাহস! যদি বাবার পায়ে লাগত কি হতো তাহলে?"

"কিছুই হতো না। আমি তৎক্ষণাৎ প্রণাম করতাম।"

"তুমি বুঝতে কি করে?"

"হাঃ, হাঃ, হাঃ, তোমার বাবার পা আর তোমার পা বুঝতে পারব না!" এই বলে সে তার পা দুটো বাড়িয়ে দিয়ে আবার আমার পায়ের উপর রাখল।

তেতাল্লিশ বছর আগের ঘটনা! কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! আমি সেই টেবিলে বসে আছি—আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। ও একটা পাঞ্জাবী পরেছে, ওর বুকটা খোলা, ওর ফর্সা গলাটা আমি দেখছি—ওর হাত দুটো টেবিলের উপর, আমার হাত ধরবার ওর সাহস নেই। আমি পা দুটো সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছি—পারছি না, পারছি না, একি অন্যায়! একি পাপ? কি করি এখন? মা বলেছিলেন অনাত্মীয় কোনো পুরুষ মানুষকে ছোঁবে না, তাহলে শরীর খারাপ হয়ে যায়—কথাটা ঠিকই। আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে কিন্তু ও পা সরাচ্ছে না—আমার পায়ের উপর তা দৃঢ়সংবদ্ধ, এখনও, এই এখানে, এই খানেই—

আমার কপালের উপর একটা ঠাণ্ডা হাত কে রাখল, আমি যুগান্তরের ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। পাশে দাঁড়িয়ে আছে লেখা। সে আস্তে আস্তে বললে, "মা আপনার এমন কেউ নেই, যাকে মনের কথা সব বলতে পারেন? বোনকে, মেয়েকে, বন্ধুদের? আপনার কি হয়েছে কাউকে না বললে তো হবে না।"

স্বাধীনতা-যুদ্ধের নানা রকম হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে, হিংস্র এবং অহিংস দুই-ই। প্রেসিডেন্সি কলেজে হাঙ্গামা লেগেই আছে। একদিন ছেলেরা অধ্যক্ষ স্টেপলটনের রক্ত চেয়েছিল। আজকালকার মতো সে রকম ঘটনা তখন হামেশা ঘটত না। যদিও বাবার সাথে স্টেপলটনের শত্রুতা খুবই, তবুও সেদিন তিনি তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। কলেজের হাতার মধ্যে পুলিশের গুলিতে একটি ছেলে আহত হলে ক্রুদ্ধ ছাত্রের দল কলেজ ঘিরে ফেলে। তখন পুলিশ চলে গেছে, ছাত্রদের দাবী ঐ আহত ছেলেটির রক্তের সঙ্গে স্টেপলটনের রক্ত মেশাতে হবে। তখন

বাবা মধ্যস্থতা করেন যে স্টেপলটনকে নিরাপদে বের করে নিয়ে আসবেন যদি তিনি ঐ আহত ছেলেটির কাছে ক্ষমা চান। সে সময়ে ঐটুকুতেই হতো। স্টেপলটন রাজী হলেন, তারপর গাড়িতে উঠেই অন্য মূর্তি, বলেন কি আমি পরে ক্ষমা চাইব। বাবা তখন বললেন, "ঠিক আছে তাহলে আমি এখনই নেমে যাচ্ছি, তুমি ছাত্রদের সঙ্গে বোঝাপড়া কর।" স্টেপলটন বাবাকে কিছুতে ছাড়বেন না। উনিও নেমে যাবেনই, তখন তিনি তাঁর কোট ধরে ঝুলে পড়লেন, বাবা নিরুপায় হয়ে কোটটি খুলেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই কোট ধরে ঝোলার হাস্যকর ব্যাপারটি বাবা সেদিন খাবার টেবিলে সবিস্তারে বলে আমাদের খুব হাসিয়েছিলেন। মির্চা তখনই ঠিক করল যে পরের দিন 'রেভলিউশন' দেখতে যাবে।

বলা নেই কওয়া নেই সকালে সে বেরিয়েছে, সারাদিন কেটে গেল, সবাই উদ্বিগ্ন। মা ঘর-বাইব করছেন, পরের ছেলে বিপদে পড়ল কিনা। কাকা যখন পুলিশে খবর দিতে যাবেন এমন সময় মূর্তিমান এসে হাজির, ধূলি-ধূসরিত, সারাদিন ঘুরে উস্কো-খুস্কো এবং নিরতিশয় হতাশ। যেখানে যেখানে পিকেটিং হচ্ছে ঘুরেছে, পথে পথে ঘুরেছে বিপদের সন্ধানে কিন্তু কোনো বিপদ হয়নি। উপরের জানালা দিয়ে কেউ একজন একটা দই-এর ভাঁড় ফেলেছিল, সেটাও ওর গায়ে পড়ল না, পড়ল কিনা সামনে। এমন কিছু ঘটল না যাতে দেশে ফিরে গিয়ে কোন চিহ্ন দেখাতে পারে। ওর ভয়, দেশে সবাই বলবে, ভারতে যখন রেভলিউশন হচ্ছিল তখন তুমি কোন গর্তে লুকিয়েছিলে? সে যে ভারতে এসেছিল এটা নিজের দেশের লোককে কি করে বিশ্বাস করাবে এই ওর এক ভাবনা। কারণ ওর দেশ থেকে এই প্রথম কেউ ভারতে এসেছে। এদিকে চামড়াও যথেষ্ট রোদে পোড়া হচ্ছে না। তাই একদিন সকালে উঠে একটি মাদুর নিয়ে ছাতে চলে গেল, সেখানে মুখের উপর একটা তোয়ালে চাপা দিয়ে বেলা দুপুর অবধি শুয়ে রইল। তারপর বিকেলবেলা তার সারা গায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। আমরা ছোটরা খুব হাসছি, বিশেষ যে সহানুভূতি আছে তা নয়। মা খুব উদ্বিগ্ন, এ ছেলে তো পাগলামি শুরু করেছে। ইয়োরোপের একটি দুরন্ত ছেলেকে সামলানো কঠিন, বিশেষ করে ভাষাটাও তেমন রপ্ত নেই। চাঁদসীর মলম এল। মা দেখিয়ে দিলেন, কাকা লাগাতে লাগাতে মার ভর্ৎসনাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে লাগলেন।

বাবা পরে ওকে বোঝালেন, "দেখ মির্চা, তুমি যে ভারতে এসেছ তা তোমার কথা শুনেই সবাই বুঝতে পারবে, তোমার ভিতরেও পরিবর্তন আসবে। সেটাই

তো আসল। গায়ের রং ব্রাউন তো অন্যত্রও রোদে শুয়ে থেকে করা যায়—কিন্তু আসল পরিবর্তন করবে ভারতীয় দর্শন, তুমি যা পড়েছ তাতেই রূপান্তর হবে।

তা ছাড়া রেভলিউশন? রেভলিউশন দেখার জন্য দৌড়াদৌড়ি করে লাভ নেই। ভারতে এখন সর্বত্র রেভলিউশন হচ্ছে। পিকেটিং আর কাঁদুনে গ্যাসই কি একমাত্র দ্রষ্টব্য বস্তু? এই যে তুমি আমাদের বাড়ি আছ, এটাই তো একটা রেভলিউশন—আমার বাবার বাড়িতে কি থাকতে পারতে? তাহলে আমার স্ত্রী তোমার সামনে মুখ ঢেকে বেরুতেন, আর এই অমৃতা, ছেলেদের কলেজে গিয়ে কবিতা পড়ে, এ কখনো হতে পারত? তোমার বাসন আলাদা হতো, তুমি ছুঁয়ে দিলে ভাত ফেলা যেত—সে এক ব্যাপার, সে অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে আজ এই বাড়িই একটা রেভলিউশন।"

সাহিত্য পরিষদের প্রকাণ্ড সাহিত্যসভা হবে, এখন যেখানে গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল সেইখানে। এই প্রথম আমি স্বরচিত গদ্য প্রবন্ধ পড়ব—বিষয়বস্তু 'সুন্দরের স্থান কোথায়?' সুন্দর কি বাইরে আছে? না মানুষের মনে? কথাটা নিয়ে এত ঘোরপ্যাচের দরকার কি? সুন্দর তো বহির্বস্তু হতেই পারে না, মানুষই সুন্দর দেখে তার চোখে অর্থাৎ মনে নীলাঞ্জন মায়া। এই প্রবন্ধের জন্য আমি রীতিমত পরিশ্রম করছি—যা লিখছি বাবার পছন্দ হচ্ছে না—যা হোক শেষ পর্যন্ত খাড়া হয়েছে। এখন একটা পরীক্ষা সামনে। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল কিন্তু তিনি আসতে পারবেন না, হায়দ্রাবাদে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এই নিয়ে অকুস্থলে অর্থাৎ সাহিত্যসভায় খুব নিন্দা হবে তাঁর। রবীন্দ্রনাথকে দু-কথা শোনাতে কেউ ছাড়ে না এদেশে। আমি অবাক হয়ে দেখি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে, তাঁর কাছে একবার যেতে সবাই উদগ্রীব, সামনে গেলে তো বিগলিত কিন্তু আড়ালে নিন্দা করতে সহস্রমুখ। ওঁর সম্বন্ধে বাবারও অনেকটা এরকম ভাব আছে। বাবা এত পড়েছেন রবীন্দ্র-কাব্য, এত আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আকর্ষণেরও অন্ত নেই, অথচ সমালোচনা চলে নিরবচ্ছিন্ন, বিশেষ করে আমাকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে শোনানো হয়, যেন আমি তাঁর 'স্খলন-পতন-ত্রুটির' জন্য দায়ী।

সভাক্ষেত্রে হলও তাই। নানা অপ্রীতিকর মন্তব্য হল—আমার মনটা বিষণ্ণ, যদিও ঐ দিন আমি খুবই পুরস্কৃত হয়েছি—এতবড় সভায় এর আগে আমি কখনো গদ্য প্রবন্ধ পড়ি নি। কবিতা অবশ্য পড়েছি অনেক, সেনেট হলেও।

সেদিন আমিই কনিষ্ঠ সাহিত্যিক, জ্যেষ্ঠা ছিলেন মানকুমারী বসু—মধুসূদনের ভাইঝি। বিধবার থান বাংলা করে প'রে খালি পায়ে তিনি সভাস্থ মঞ্চে কবিতা পড়লেন। দুই যুগের কী পরিবর্তন! আমি ভাবলাম মির্চা এ রেভলিউশনটা দেখলে বুঝত।

বাড়ি ফিরে দেখি সে চুপচাপ বসে আছে। এখানে ও একা, বন্ধুবান্ধব নেই আমরা ছাড়া। তাই ওকে বললাম চল বারান্দায় বসে গল্প করা যাবে।

নানা কথার মধ্যে মির্চা হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি এত বিষণ্ণ কেন?"

আমি ওকে বললাম সভায় যা যা হয়েছে—সভায় কিভাবে তাঁকে নিন্দা করা হয়েছে, তিনি কথা রাখতে পারেন নি বলে। এবার বিষণ্ণ হবার পালা ওর। দু-একটা কথার পর বলল—"একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ মানুষকে তুমি এইটুকু মেয়ে এত ভালোবাস কি করে?"

রাগে আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, "কেন? বেশি বয়স হলে মানুষ ভালোবাসা পাবার অযোগ্য হয়ে যায় নাকি?"

ও একটু উত্তেজিত, "দেখো অমৃতা—হয় তুমি নিজেকে চেন না, নয় তুমি নিজেকে ঠকাও, কারণ সত্যকে দেখবার সাহস তোমার নেই, কিংবা জেনেও মিথ্যা কথা বলছ।"

"মির্চা, আমার অসম্ভব মাথা ধরেছে তুমি একটু চুপ কর।"

বাবা বলেছেন, "রু, তুমি মির্চার কাছে একটু ফ্রেঞ্চ শেখ, ফ্রেঞ্চ না শিখলে একমপ্লিশমেণ্ট পূর্ণ হয় না।" বাবা আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। অনাদি দস্তিদার বাড়িতে আসেন গান শেখাতে, রমেন চক্রবর্তী আসেন ছবি আঁকা শেখাতে, একজন গোয়ানিজ মাস্টার ভায়োলীন বাজান শেখাতে! এত বিদ্যা সামলানই আমার দায় হয়েছে, এদিকে আমার কিছু ভালো লাগে না এসব করতে, আমার কোনো অধ্যবসায় নেই—কবিতার বই হাতে নিয়ে জানালার ধারে বসে—মন ভেসে যায় কোন সুদূর—। যাক, মির্চা আমার কাছে বাংলা শিখবে, আমি ওর কাছে ফ্রেঞ্চ। খুব সাধু সংকল্প নিয়ে পড়তে বসা হয়, পড়া আর এগোয় না। কেন যে এগোয় না কে জানে! ওর ঘরেই আমরা পড়তে বসি, মাঝখানে একটা বাতি জ্বলে, স্ট্যাণ্ডিং ল্যাম্প, কতদিন কত রাত হয়ে যায়—বলাকার কবিতা পড়ি আমি, ও শুনতে ভালোবাসে কিন্তু অন্য ভাষায় ঐ কবিতা বোঝানো কি আমার সাধ্য—একটা কবিতা ও বুঝতে